৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট

মে দিবসের মঞ্চ থেকে ধর্মঘট সফল করার শপথ

১৩৯ বছর আগের লড়াই। পুরোনো তো হয়নি, বরং যেন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে আজকে। আজ যখন গোটা দুনিয়ার তাবৎ সম্পদ জড়ো হয়েছে মুষ্টিমেয় কর্পোরেটের সিন্দুকে। আজ যখন বৈষম্য অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ব্যাপকতর। আজ যখন পুঁজির হিংস্রতম সঞ্চায়নের লক্ষ্যে দুমড়ে মুচড়ে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে চালু এর আইনগুলিকে; রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অর্জিত শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারগুলিকে বাতিল করা হচ্ছে; আজ যখন শ্রমজীবী জনতাকে দুর্দশার গভীরতম খাদে ঠেলে ফেলে তার আধমরা বুকের উপর পা তুলে উঠে দাঁড়াচ্ছে নব্য-ফ্যাসিবাদ দুনিয়াজুড়ে; দুনিয়াজুড়েই আজ তখন নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করছে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী। লুঠেরা পুঁজিবাদ ও নব্য-ফ্যাসিবাদের উত্থানের প্রেক্ষাপটেই, গত কয়েক বছর ধরে দুনিয়ার দেশে দেশে অভূতপূর্ব সব মুক্তি লড়াই লড়ছে শ্রমিকশ্রেণী। নিউইয়র্কের অ্যামাজন স্টোর থেকে স্যামসাং; ইন্ডিয়ার তামিলনাড়ুর প্লান্ট অবধি।

শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির এই প্রেক্ষাপটেই এ বছর পালিত হল ঐতিহাসিক মে দিবস। প্যারিস থেকে টোকিও, বার্লিন থেকে ম্যানিলা, হাভানা থেকে কলকাতা—সর্বত্রই মে দিবস পালিত হয়েছে বৃহৎ এবং আগ্রাসী চেহারায়। খোদ মার্কিন মুলুকে ৭০টির বেশি জায়গায় হয়েছে বড় বড় সমাবেশ,

প্রবীর মুখার্জী

মিছিল। এ বছর নজরকাড়া শ্রমিক সমাবেশ হয়েছে শ্রীলঙ্কার মাটিতে। নয়া নির্বাচিত বামপন্থী সরকারের কবলে নিশ্চিতভাবেই সে দেশের শ্রমিক আন্দোলনে সঞ্চারিত হয়েছে নতুন প্রাণশক্তি।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে মে দিবস। দিন দুয়েক আগের মহাসমাবেশেই বাংলার শ্রমজীবী জনতা ঘোষণা করেছিলেন সংগ্রামী প্রত্যয়। জাত-ধর্মের বিভেদ রুখে মেহনতির ঐক্য গড়ার ডাক। ২০ এপ্রিলের ব্রিগেড সমাবেশ থেকে ৯ জুলাই-র সাধারণ ধর্মঘট অবধি যাত্রাপথের ক্যালেন্ডারে উজ্জ্বল মে দিবসের পয়লা তারিখ। শ্রেণী সংগ্রামের গনগনে আঁচে কর্মচারী ভবনের সংক্ষিপ্ত সভা, শহীদ মিনারের সমাবেশ থেকে বাংলার প্রতিটি জেলাতে উদ্‌যাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস।

প্রায় প্রতিটি জেলার কর্মচারী ভবনে যথাযথ মর্যাদার সাথে সকালে রক্তপতাকা উত্তোলন ও অমর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। জেলা দপ্তর থেকে মহকুমা ও ব্লক স্তরেও উৎসাহ ও সংগ্রামী মেজাজে মে দিবস পালিত হয়েছে। এরপর শ্লোগান মুখরিত রক্ত পতাকায় সুসজ্জিত মিছিল পরিক্রমা করে। বিকালে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমাতে মে দিবসের জমায়েত ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলোও মে দিবস পালন করে।

কেন্দ্রীয় কর্মসূচীটি অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে বেলা ৩টে থেকে। সভাপতি মানস দাস রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর সাধারণ সম্পাদক সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বগণ অমর শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পরবর্তী পর্যায়ে মানস দাসের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়।

শহীদ মিনারমুখী মিছিল

সভার শুরুতে প্রথম বক্তব্য উত্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি ১৩৬তম শ্রমিক সংহতি দিবসে সকলকে সংগ্রামী

● দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরস্থ অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন সংগ্রামী সংগঠন রাজ্য

বলছেন সাধারণ সম্পাদক

কো-অর্ডিনেশন কমিটি। জন্মলগ্ন থেকেই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস বহন করে চলেছে এই সংগঠন, একই সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এই সংগঠন অগ্রণী ভূমিকা প্রতিপালন করে চলেছে। এমন একটি ঐতিহ্যশালী সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব প্রতিপালনের সুযোগ পেয়ে নদীয়া জেলার সকল স্তরের কর্মী নেতৃত্ব, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং প্রাক্তন নেতৃত্বরা আনন্দিত এবং গর্বিত। এক অদ্ভুত আধারের মধ্যে আমাদের পথ চলতে হচ্ছে। দেশ ও রাজ্যের সরকারের বিভাজনের রাজনীতি প্রতিহত করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে নদীয়া জেলা শ্রীচৈতন্যদেব-এর উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। দীর্ঘ ৪৩ বছর পর রাজ্য সম্মেলন সার্বিকভাবে

রাজ্য সম্মেলনের লোগো

সফল করার ক্ষেত্রে জেলা সংগঠন তার সংগ্রামী-সময়োপযোগী ভূমিকা প্রতিপালন করতে পারবে এ বিষয়ে আমরা প্রত্যয়ী। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভায় এই আহ্বান রাখেন জেলা সংগঠনের নেতৃত্ব সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বরা।

বিগত ৬ মে, ২০২৫ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরস্থিত পাত্রবাজার-এ সংগঠনের জেলা দপ্তর সমিতি ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের সভা ও সদস্যদের পরিবার সহ দানমেলা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, নদীয়া জেলা সাংস্কৃতিক শাখা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন নদীয়া জেলা কমিটির সভাপতি প্রদীপ রাহা, সভাপতির আহ্বানে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়, সভাপতি মানস দাস, নদীয়া জেলা

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান সহ অন্যান্য দাবিতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি /৪৭/২৫ তারিখ ঃ ২৭/০৫/২০২৫

মাননীয়া
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ,
নবান্ন, হাওড়া

বিষয় ঃ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বকেয়া এবং প্রাপ্য মহার্ঘভাতা প্রদানসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দাবি সমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি বিধান সম্পর্কিত

মহাশয়া,

আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে গত ১৬ মে, ২০২৫ ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীদের বকেয়া এবং প্রাপ্য মহার্ঘভাতার অন্তত ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ প্রদানের রায় ঘোষণার দিন থেকে আগামী ছ-সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত এই রায় দিয়েছেন কলকাতা সর্বোচ্চ উচ্চ ন্যায়ালয়ের গত ২০ মে ২০২২-এর বিচারাধীন মামলার (ডব্লিউ পি এস টি নং ১০২/২০২০) রায় এবং ২২.০৯.২২-এর আর একটি মামলার রায় (আর.ভি. ডব্লিউ. পি.এস.টি. নং ১৫৯/২০২২)-এর পরিপ্রেক্ষিতে। আপনি জানেন, এই মামলাগুলির রায় দিতে গিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয় সমস্ত দিক বিচার করে দ্ব্যর্থহীনভাবে মহার্ঘভাতাকে আইনী বলবৎযোগ্য অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রায়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে উচ্চ ন্যায়ালয় রাজ্য সরকারের সংবিধানের ৩০৯ নং ধারা অনুশীলনের মাধ্যমে যে রোপা রুলস্ প্রণয়ন করেছেন এবং সেখানে সর্বভারতীয় মূল্যসূচক (এ. আই. সি. পি. আই)-এর ভিত্তিতে "মহার্ঘভাতা"-র যে ব্যাখ্যা সংজ্ঞায়িত হয়েছে, তার উপর নির্ভর করেছেন। [রুল ৩(সি) রোপা রুলস্ অর্থ দপ্তরের নোটিফিকেশন নম্বর ২৬৯০-এফ তারিখ ২৩.২.২০০৯]। এই রুলসের ব্যাখ্যামূলক স্মারক সংখ্যায় (অর্থ দপ্তর মেমোরেন্ডাম নম্বর ১৯৬১-এফ তারিখ ২৩.০২.২০০৯) ১লা জানুয়ারী ২০০৬ থেকে মহার্ঘভাতা সরকারী কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ অধিকার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং ঐ দিন থেকে প্রাপ্ত মহার্ঘভাতা মূল বেতনের সাথে যুক্ত হবে বলে যা বলা হয়েছে, তা উচ্চ ন্যায়ালয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বারে বারে উল্লেখিত হয়েছে যে তৎকালীন রাজ্য সরকার ঐ নীতিগত গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ১ জানুয়ারী ২০০৬ থেকে ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেরিতে হলেও প্রদান

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার— লড়াইয়ের হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার ৫২ বর্ষ সম্পূর্ণ করে ৫৩ বর্ষে পড়তে চলেছে আগামী মে, ২০২৫ সংখ্যায়। বিগত ৫২ বছরে সংবাদ পরিবেশনার জগতে প্রযুক্তিগত বিপুল পরিবর্তন এসেছে। একদিকে যেমন সংবাদপত্র থেকে দূরদর্শন হয়ে ইন্টারনেট এবং সর্বশেষ স্যোশাল মিডিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে, সংবাদ পরিবেশনের প্রক্রিয়াও, চরিত্রগতভাবেও বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেছে সংবাদমাধ্যমে। ৫০ বছর আগে কিছুটা হলেও সংবাদপত্র খবর পরিবেশন করত, সরকারকে প্রশ্ন করত। একটা স্বাধীন চরিত্র বজায় রাখতে চেষ্টা করত। কিন্তু বিগত ৫০ বছরে মিডিয়া মালিক, শিল্পপতি এবং রাজনীতিবিদেরা একত্রিত হয়ে সংবাদ পরিবেশনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মিডিয়া এখন সরকারকে প্রশ্ন করে না, বিরোধীদের প্রশ্ন করে। সংবাদমাধ্যম এখন শিল্পপতি ও রাজনীতিবিদদের স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংবাদ পরিবেশন নয়, সংবাদ তৈরী করা এখন সংবাদ মাধ্যমের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেরালার ভয়াবহ বন্যার খবর তৈরী হচ্ছে বাঙ্গালোরে বসে। পি. সাইনাথের ভাষায় একটা বড় অংশের সাংবাদিক বর্তমানে কর্পোরেট স্টেনোগ্রাফারে পরিণত হয়েছেন। ভারতের সব থেকে ধনী ব্যক্তি সব থেকে বেশি সংখ্যক মিডিয়ার মালিকে পরিণত হয়েছে। ২০০৮-এর মন্দার পরবর্তী সময়ে এবং ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসারের ফলে সংবাদ ব্যবসা বিপুল ধাক্কা খায়। ফলে মিডিয়া আরও বেশি বেশি করে বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের উপর, সরকারী বদান্যতার উপর এমনকি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপনের উপর আরও বেশি বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকার পরিবর্তন আরও ব্যাপকভাবে হয়েছে, কারণ গত পঁয়ত্রিশ বছরে ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের যে বেসরকারীকরণ ঘটেছে তা কুক্ষিগত হচ্ছে যাদের হাতে তারাই ভারতীয় মিডিয়ার মালিক। ফলে মিডিয়ার পক্ষে সরকার বিরোধী অবস্থানে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। জরুরি অবস্থার সময়ে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে অভিযোগ করা হত যে সংবাদপত্রকে 'নত' হতে বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা 'হামাগুড়ি' দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু বর্তমানে মিডিয়াকে কোনও নির্দেশ দিতে হয়নি, তারা নিজেদের স্বার্থেই সরকারের হয়ে গলা ফাটাচ্ছে। মিডিয়ার বিপুল অংশ বিশাল পরিমাণে ইলেকটোরাল বন্ড কিনেছে—এ থেকে বোঝা যায় মিডিয়া আর ক্ষমতাসীন দলের সখ্যতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

বর্তমান উত্তর-সত্য সময়পর্বে কোনো সামান্য ঘটনার উপর ভয়ানক রঙ চড়িয়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ঘটনার নির্মাণ করছে মিডিয়া। সাম্প্রতিক সময়ে কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী হামলায় ২৬ জন পর্যটকের প্রাণনাশ ঘটে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সারা ভারতবর্ষের মানুষ ক্রোধ ও তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে। মানুষের এই ক্রোধকে বিপথে চালিত করতে মিডিয়া পাকিস্তানের ইসলামাবাদ দখল, করাচী দখলের মিথ্যা গুজব পরিকল্পিতভাবে ছড়াতে

● তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

কর্মচারীদের ছুটি বাতিল সংক্রান্ত আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবিতে পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ৪৬/২৫ তারিখ ঃ ০৮/০৫/২০২৫

প্রতি,
মাননীয় বিশেষ সচিব,
অর্থ দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয় ঃ রাজ্য কর্মচারীদের ছুটি বাতিল সংক্রান্ত আদেশনামা প্রত্যাহারের আবেদন

সূত্র ঃ আদেশনামা নং ১৬৮৪-এপ(পি২), তাং ০৭/০৫/২০২৫

মহাশয়,

আপনার স্বাক্ষরিত উপরোল্লেখিত আদেশনামাটির প্রতি রাজ্যের সমগ্র কর্মচারী সমাজের পক্ষ থেকে আমরা দ্বিমত পোষণ করছি। এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যা খবর, দেশের সরকার অথবা দেশের অন্য কোনও রাজ্যের সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনও আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি এবং আমরা মনে করি অকস্মাৎ প্রকাশিত এই ধরনের আদেশনামা শুধুমাত্র আমাদের সহকর্মীদেরই হয়রানির কারণ হয়ে দাঁড়াবে তাই নয়, এটি রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। এমতাবস্থায় যথাশীঘ্র সম্ভব সামগ্রিক বিষয় পুনর্বিবেচনা করে এই আদেশনামাটিকে প্রত্যাহার করার অনুরোধ রাখছি।

ধন্যবাদান্তে,

ইতি
ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

সংগ্রামী হাতিয়ার
মে, ২০২৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
তেপান্নতম বর্ষ ☐ প্রথম সংখ্যা ☐ মূল্য ঃ ২ টাকা

সম্পাদকীয়

সর্বোচ্চ আদালতের রায় কার্যকরী করতে রাস্তার লড়াই জরুরি

দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়, সুপ্রিম কোর্ট গত ১৬ মে '২৫ ডিএ মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশে রাজ্য সরকারকে আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতার অন্তত ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে বলেছে। রাজ্যের কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী মহলে সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বিবৃতি দিয়ে এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের প্রেক্ষাপট হল পঞ্চম বেতন কমিশনের রিপোর্ট, যা বিগত বামফ্রন্ট আমলের শেষ বেতন কমিশন ছিল। সেই রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের মতোই এ আই সি পি আই অনুযায়ী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ এই বক্তব্যকে ভিত্তি করেই দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকারের আমলের কৃতকর্মের সুফল সেই সরকার চলে যাওয়ার প্রায় ১৪ বছর পরেও ভোগ করছে এ রাজ্যের কর্মচারী সমাজ।

সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশ ঘোষণার পর, বিশেষ করে এই নির্দেশের মর্মবস্তু উদ্‌ঘাটন করার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল জমানায় প্রায় সব হারাতে বসা কর্মচারী মহলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই হিসাব কষতে শুরু করে দিয়েছেন বকেয়ার ২৫ শতাংশ স্ব স্ব ক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ অর্থ হতে পারে, তার। এই ধরনের উৎসাহ বা কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। কর্মচারী মহলে উৎসাহের কারণ শুধু কিছু অর্থ হাতে আসবে বলেই নয়। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে কর্মচারী সমাজ তাদের প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অমানবিক আচরণ, কর্মচারীদের কুকুর, বিড়ালের সাথে তুলনা করা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমন করা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত জবাব বলে মনে করছে। আমাদের বক্তব্য, বকেয়ার হিসেব কষা চলুক, কোনো সমস্যা নেই, একই সাথে মস্তিষ্ককে সজাগ রাখতে হবে বিপদের অন্য সম্ভাবনার দিকগুলি প্রসঙ্গেও। এই সরকারের বিগত সময়ের ইতিহাস বলছে আদালতের রায়কে মান্যতা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকার সবক্ষেত্রে স্বচ্ছ থেকেছে তা নয়। বর্তমান 'ডিএ' মামলার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল (স্যাট)-এর রায়ের বিরুদ্ধে এই সরকার হাইকোর্টে আপিল করে। হাইকোর্ট একই রায় দিলে, তারা সুপ্রিম কোর্টে যায়। বিগত ১৬ মে, '২৫ সুপ্রিম কোর্ট ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে এই অন্তর্বর্তী নির্দেশিকা জারি করেছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ কার্যকর করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কিন্তু এই সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন থেকে কিছু আশঙ্কা থেকে যায়।

এই নির্দেশকে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমগ্র শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক মহলে বিভাজন তৈরীর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার অপচেষ্টা হতেই পারে। বলা হল একটি বা দুটি অংশের ক্ষেত্রে এই নির্দেশ কার্যকরী করা হবে। বাকি অংশে নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার অন্তর্বস্তুকে উপেক্ষা করে, তার একটি বা দুটি শব্দকে ব্যবহার করে এই প্রয়াস সরকার নিতে পারে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বঞ্চিত করার উদ্যোগ নিতে পারে। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের যে অত্যন্ত ইতিবাচক ঐক্য এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে তাকে ধ্বংস করতে এই কূট-কৌশল ব্যবহার করতে পারে সরকার। তাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিয়ে বৃহত্তর ঐক্যের যে মঞ্চ গঠিত হয়েছে সেই ঐক্যকে ভাঙার কোনো অপকৌশল যেন সফল না হয়। ওরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে ভয় পায়। তাই বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ সমস্ত অংশের কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনোরকম ব্যতিক্রম সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। এইরকম প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হলে রাস্তায় নামতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের ডিএ মামলা রোপা ২০০৯-কে ভিত্তি করে চলছে। এর পূর্ণাঙ্গ রায় আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বেরিয়ে আসবে। এই মামলায় কর্মচারীদের পক্ষে ইতিবাচক প্রেক্ষাপট তৈরী করেছে বামফ্রন্ট আমলের পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ। তৃণমূল জমানায় অনেক লড়াই সংগ্রাম করে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ লাগু হয়েছে। সেই সুপারিশ প্রকাশ্যে আসেনি। এই ঘটনা বিগত পাঁচটি বেতন কমিশনের ক্ষেত্রে কখনো ঘটেনি। সুপারিশ প্রকাশ্যে না এলেও এটা জানা গেছে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশে মহার্ঘভাতা বা ডিএ-র কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। এক্ষেত্রে সরকারের ঘোষিত বক্তব্য যে সরকার এ আই সি পি আই মানবে না, যখন মনে করবে তখন ডিএ ঘোষণা করবে।

এই ক্ষেত্রে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের বর্তমান ডিএ মামলার চূড়ান্ত রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই রায়ে যদি রাজ্য সরকারকে বেতন কমিশনের সুপারিশ নির্বিশেষে সর্বভারতীয় ভোগ্যপণ্য সূচক (এ আই সি পি আই) অনুযায়ী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার নির্দেশ দেয়, তাহলে বর্তমানে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা আদায়ের একটি আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা সবাই চাই সর্বোচ্চ আদালতের চূড়ান্ত রায় এই ধরনের দিকনির্দেশ দেবে।

যে রায়ই আদালত দিক তাকে কার্যকর করতে সরকারকে বাধ্য করতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া অন্যথা কিছু নেই। বিচারব্যবস্থা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, কিন্তু সেই অধিকার প্রকৃত অর্জন করতে সংগ্রাম ছাড়া বিকল্প রাস্তা নেই। পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া মহার্ঘভাতা আদায় করতে এবং তা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাজনের কোনোরকম সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের। ষষ্ঠ বেতন কমিশন লাগু হবার পর এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা আদায় সহ অন্যান্য অধিকার রক্ষার তীব্র প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে হবে আমাদের।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলায় রাজ্য সরকারের বিপক্ষে লড়াইয়ে যে আইনজীবীরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার অন্যতম মুখ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলায় জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি প্রধান সওয়ালকারী ছিলেন। ২০ মে ২০২২ যেদিন কলকাতা হাইকোর্ট ডিএ প্রসঙ্গে কর্মচারীদের পক্ষে ইতিবাচক রায় দেয় সেদিন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মহার্ঘভাতা সহ অন্যান্য দাবিতে সারা রাত ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী করেছিল রানী রাসমনি এভিনিউতে। সেই রায়দানের পরই ২০ মে '২২ এই কর্মসূচীতে বক্তব্য রেখেছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি সেদিন বলেছিলেন, ''মহার্ঘভাতা পাওয়া যে কর্মচারীদের অধিকার তা রাজ্য সরকার এতদিন মানতে চায়নি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর কর্মচারীদের কাছে হেরেছে রাজ্য সরকার। মহার্ঘভাতা সরকারকে দিতেই হবে, এই রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।... তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। আদালতের নির্দেশ কার্যকরী করতে সরকার যাতে বাধ্য হয় তার জন্য আপনাদের এভাবেই মাটি কামড়ে লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হবে।''

সর্বোচ্চ আদালত কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতি আদায় করতে এবং অন্যান্য বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে তীব্র লড়াই ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। তাই যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ২৪ জুন, '২৫ সুপ্রিম কোর্টের রায় অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবিতে এবং আগামী ৯ জুলাই '২৫ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রতিটি জেলায় এবং কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে তিন ঘণ্টার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীতে পথে নামছে কর্মচারী সমাজ। □

'পথে এবার নামো সাথী / পথেই হবে এ পথ চেনা'

৩১ মে, ২০২৫

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

মে দিবসের মঞ্চ থেকে ধর্মঘট সফল করার শপথ

অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। আজ থেকে ১৩৬ বছর আগে ১৮৮৬ সালে শ্রমিকরা তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন, আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন, এবং ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে যে সংগ্রাম হয়েছিল, তার পরবর্তী ১৮৮৯ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে দিয়ে তা স্বীকৃতি লাভ করে। তার মধ্যে দিয়ে যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা শুধুমাত্র আট ঘণ্টা কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়; শিকাগোর হে মার্কেটে সংগ্রামী লড়াকু কমরেডরা তাঁদের আত্মবিসর্জনের মধ্যে দিয়ে যে অধিকার বোধটাকে জাগ্রত করেছিলেন সেটা প্রমাণ করে লড়াই সংগ্রাম ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই। সংগ্রাম, সর্বোচ্চ সংগ্রাম, ধর্মঘট, লাগাতার ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, ঐতিহাসিক মে দিবস তার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সমাজের মধ্যে থেকেই রাষ্ট্র তৈরী হয়। রাষ্ট্র দুটি ভাবে বিভক্ত। একটা হল শোষক শ্রেণী এবং অপরটি হল শ্রমজীবী জনগণ। এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে চলে। ফলে শ্রমজীবী মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্যে থাকতে হয়। এই সংগ্রাম শুধুমাত্র মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম নয়, এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আপামর খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনও যুক্ত হয়। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি দেখি, ১৮৬০ সালে মে মাসে হাওড়া স্টেশনের ১২৬০ জন স্কটিশ মজদুর আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষে শ্রমিক জাগরণের সূচনা। এই ধর্মঘটের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার হে মার্কেটে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ঐতিহাসিক মে দিবসের ঘটনাবলী সংগঠিত হবার ২৬ বছর আগেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণী আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে না পারলে অধিকার অর্জন করা যায় না। আজকে আমরা এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করছি। আর এই বাস্তবতা হল বিশ্বব্যাপী বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষ তার বাইরে নয়। ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে যা সম্পদ আছে সেই সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ। ভারতে উদার অর্থনীতি কার্যকরী হওয়ার পরবর্তীকালে শ্রমজীবী, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের পরিপন্থী সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের যে ভূমিকা প্রতিপালন করা দরকার, সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে যে ভূমিকা প্রতিপালন করা দরকার বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তা প্রতিপালন করছে না। ১৪০ কোটি নাগরিকের ভারতবর্ষে এখন সব থেকে বড় সমস্যা হল বেকারত্ব। মানুষ কাজ পাচ্ছেন না। যাঁরা কাজ পেয়েছিলেন তাঁদের কাজ হারাতে হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে জলের দরে বিক্রি করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের বুকে ২৯টা শ্রম আইন যেটা কার্যকর ছিল সেটা তুলে দিয়ে ৪টি শ্রমকোডে রূপায়িত করা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির সুযোগকে ব্যবহার করে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করানোর চেষ্টা করেছে। কৃষি, শিক্ষা ও শ্রম আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া তারা গ্রহণ করেছেন। আপামর শ্রমজীবী মানুষের লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলনের জন্য তা কিছুটা থমকে আছে। আবার বিজেপি শাসিত অনেক রাজ্যে ইতিমধ্যে শ্রমকোড চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি মে দিবসের ছুটি বাতিলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আগামী দিনে মে দিবসের কর্মসূচী পালন করতে পারব কি না তা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি পেশ করার কোনো অধিকার আমাদের থাকবে না। তীব্র বেকারত্বের সমস্যাকে ধর্মীয় উন্মাদনায় মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। ২৬০০০ শিক্ষকের চাকরি চলে গেল। যাঁরা যোগ্য তাঁরা কাজ হারিয়ে রাজপথে অবস্থান করছেন। কাশ্মীরে যে জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তার বিরুদ্ধে সরকারের যে ভূমিকা প্রতিপালন করা উচিত তা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি—সমস্ত সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। একইরকম পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে বিরাজ করছে। জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে পাশে সরিয়ে দীঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সরকারী কোষাগার থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে মন্দির নির্মাণের জন্য। তাই আগামী ৯ জুলাইয়ের ধর্মঘটকে সফল করার জন্য আজ আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের বার্তা আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দিতে হবে। এরপর বক্তব্য রাখেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী। ঐতিহাসিক মে দিবসে তিনি সকলকে সংগ্রামী অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এমন ধারণা এখনও অনেকেই পোষণ করেন যে, মে দিবসের ঘটনা অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় হে মার্কেটে শ্রমিক আগ্রাসনের মধ্যে দিয়েই শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এবং মে দিবস শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের একটি স্মরণীয় দিন। মে দিবস সম্পর্কে এই দুটি ধারণাই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ মে দিবসের আগে প্রায় একশো বছর ব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা ক্রমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। আবার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র মতবাদের অন্যতম স্থপতি এঙ্গেলসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতি বছর ১লা মে দিনটিকে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানায়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রথম আন্তর্জাতিকের মতো শুধুমাত্র কিছু ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের যৌথ মঞ্চ ছিল না। এটি ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিগুলোর সম্মিলনী। স্বভাবতই এই ধরনের একটি মঞ্চ থেকে কোনো একটি দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল মহান ফরাসি বিপ্লবের জঠরে। চরিত্রের দিক থেকে এই বিপ্লব বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণীই ছিল এই বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা সংগ্রামী অংশ। ফরাসী বিপ্লবের অবিসংবাদী নায়ক ব্যাবুফ-ই প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সাম্য প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। সামন্ততন্ত্র বিরোধী প্রগতিশীল ভূমিকায় উত্তীর্ণ বুর্জোয়ারা শ্রমজীবীদের সমর্থন লাভের আশায় ১৮৭৫ সালে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রদান করে। এই পটভূমিতেই এসেছিলেন রবার্ট ওয়েন। সামাজিক শোষণ ও বৈষম্য থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ওয়েন এক বিশেষ ধরনের 'ফ্যাক্টরি' ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বৈষম্যহীন ফ্যাক্টরি ব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়েনের যে ধারণা, তাকেই মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট সমাজভাবনার প্রাথমিক রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে প্যারির শ্রমিকদের নেতৃত্বে জুন বিপ্লব মাথা তুলল। ম্যানিফেস্টো তখন প্রকাশিত হয়েছে। কয়েক হাজার শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা করে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হল বিপ্লবের সম্ভাবনাকে। বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা না থাকলেও, প্যারির বুকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কিন্তু থেমে গেল না। ইউরোপ জুড়ে এই সময় কালেই শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠতে শুরু করল। ১৮৬৪ সালে মার্কসের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে নিয়েই গড়ে উঠল প্রথম আন্তর্জাতিক। ১৮৭১ সালে ফ্রান্স ও জার্মানির যুদ্ধের শেষ লগ্নে রক্ত আর বারুদের হিংসাস্তূপের মধ্যে থেকে উঠে এল শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান প্যারি কমিউন। ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানকে সংহতি জানাল জার্মানির শ্রমিক শ্রেণী।

এই পটভূমিতেই এল ১৮৮৬-র শিকাগো বিপর্যয়ের দুনিয়া কাঁপানো অধ্যায়। যদিও শিকাগোর মে দিবসের বিপর্যয় প্যারি কমিউনের নির্দয়তার কাছে তুচ্ছ ছিল। কিন্তু এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। ১৮৭১-এর প্যারি কমিউনের ঘটনা শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতাকে অনেক উঁচু পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাই সমুদ্রের অপর পারে একটি বিশাল দেশের শ্রমিকশ্রেণী যখন আট ঘণ্টা কাজের দাবি উত্থাপন করে পুঁজিপতিদের বেয়োনেটের মুখোমুখি হল, ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী তাদের সচেতনতার উচ্চতা থেকেই এই রক্তক্ষয়ী লড়াইকে সমর্থন করল। আন্তর্জাতিক চরিত্র লাভ করল শিকাগোর মে দিবসের সংগ্রাম। মে দিবসের সংগ্রামের এই আন্তর্জাতিক চরিত্রকেই স্বীকৃত দিল ১৮৮১ সালে এঙ্গেলসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। মে দিবসের প্রথম দাবি ছিল ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি। সময়ের সাথে সাথে দ্বিতীয় দাবি হিসেবে যুক্ত হল মজুরি দাসত্বের অবসান এবং তৃতীয় দাবি আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য। মে দিবসের পটভূমিতে উত্থাপিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য বহমান। এমনকি আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজির বর্তমান কালপর্বে প্রথম দাবিটিও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাই আগামী ৯ জুলাই, ২০২৫ সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমাদের অবশ্যই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে চারটি শ্রমকোড প্রণয়ন করেছে। যার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রায় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। এই চারটি শ্রমবিধি শুধুমাত্র শ্রম আইন নয়, এটি গোটা প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থাকে কর্তৃত্ববাদী রূপ দেওয়ার একটি পরিকল্পিত প্রকল্পের অংশ মাত্র। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চও স্বাধীন ক্ষেত্রভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ জনগণের উপর কার্যত দাসত্বের শর্ত আরোপ করার এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন আরো তীব্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে ১৮ মার্চ ২০২৫-এ নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের জাতীয় কনভেনশন থেকে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে ব্যাপকভাবে সফল করে তুলতে হবে যা শাসকশ্রেণীর দাসত্ব চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর দৃঢ় সঙ্কল্পকে আরো একবার প্রমাণ করবে। সকলকে পুনর্বার অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সর্বাত্মক লড়াইয়ের মাধ্যমেই ডিএ-র অধিকার রক্ষা করতে হবে

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

২০১০ সালে ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী নেত্রী এক জনসভায় বলেছিলেন, যে সরকার তার কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দিতে পারে না, সেই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। পরিবর্তনের ডাক দিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহারে 'সুশাসন'-এর জনমোহিনী শ্লোগান তুলে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, ''সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাঁদের দীর্ঘদিন যেসব বক্তব্য উপেক্ষিত ছিল, যেসব বঞ্চনা দীর্ঘদিন তারা সহ্য করেছেন, গোটা বিষয়টি যথার্থ বিবেচনার মাধ্যমে আশু পদক্ষেপ নেওয়া হবে'' (নির্বাচনী ইস্তেহার ২০১১, পৃষ্ঠা ১২)। বলা হয়েছিল, ''পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের অবস্থা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতোই শোচনীয়। ৫ম পে-কমিশনকে আপ-টু-ডেট করতে হবে। এক্ষেত্রে জানুয়ারি ২০০৬ থেকে মার্চ ২০০৮—এই ২৭ মাসের বেতন বর্তমান সরকার কোনোভাবেই দিতে রাজী নয়। এটা অবশ্যই দিতে হবে।'' আরও বলা হয়েছিল, ''সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট হয়নি। সর্বোপরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ভাড়া না থাকায় অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যের বেতন প্রায় অর্ধেক'' (নির্বাচনী ইস্তেহার ২০০৯, পৃষ্ঠা ৪৯)।

'পরিবর্তন'-এর ডাক দিয়ে অজস্র 'প্রতিশ্রুতি' আর 'ঘোষণা' করা হয়েছিল। 'উন্নয়ন' আর 'গণতন্ত্র' প্রসারিত করে জনস্বার্থবাহী গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সরকার হিসাবে কাজ করবে—নির্বাচনী ইস্তেহারে এই সমস্ত ঘোষণা করেছিল সেদিনের বিরোধী দল আজকের শাসক দল। আর আজকের রাষ্ট্রের বাস্তবতা হল বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে কম বেতন পান। ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের জন্য রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট পর্যন্ত করতে হয়েছে। আর আপ-টু-ডেট মহার্ঘভাতা? কর্মচারীরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিপূরণ বাবদ মহার্ঘভাতা আজ মুখ্যমন্ত্রীর 'চিরকুটে' দয়ার দানে পর্যবসিত। আর গণতন্ত্র প্রশাসনের অভ্যন্তরে তার লেশমাত্র নেই। অথচ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস আছে যাকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

একথা ঠিক ইউরোপের শিল্প বিপ্লবে শ্রমজীবীদের জীবনে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতিবেগ নিয়ে এসেছিল, তা আমাদের দেশে ঘটেনি। প্রাক্ ধনতান্ত্রিক-সামাজিক ব্যবস্থার অবসান না ঘটিয়েই ঔপনিবেশিক পুঁজির ছায়ায় দেশীয় পুঁজির প্রসার ঘটে। তাই সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক এবং পুঁজিবাদী—এই ত্রিবিধ শোষণের যাঁতাকলে শ্রমিকদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও অপরিবর্তিত যুদ্ধ পূর্ব বেতনহার কর্মচারীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেতনহার পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯২০ সালে ম্যাকালপিন কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি মূল্যসূচকের সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো গঠনের সুপারিশ করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বেই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণে মহার্ঘভাতা, রেশনিং ইত্যাদি গড়ে তোলে। স্বাধীনতার পরবর্তীতে ভোগ্যপণ্যের মূল্য সূচকের ভিত্তিতে বেতনের ক্ষয়রোধে মহার্ঘভাতার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম প্রধান দাবি ছিল কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা। ১৯৫৬ সালে এই দাবিতে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে তৎকালীন রাজ্য সরকার দু'টাকা হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করে। ক্ষুব্ধ কর্মচারী সমাজ মানি অর্ডার মারফৎ তা প্রত্যাখ্যান করে। এই দাবি অর্জনের জন্য সেদিন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা রাস্তায় ছিলেন। কর্মচারী নেতৃত্বকে সাসপেনশন, বরখাস্ত ও পুলিশী হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রদানে নীতি ভিত্তিক অবস্থান প্রথম গৃহীত হয় ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গটি আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারই প্রথম রাজ্যের সর্বস্তরের কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী, বোর্ড, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পেনশন ভোগীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার আওতায় আনা হয়। এই সরকারের পতন ঘটলে পুনরায় সেই অধিকার আক্রান্ত হয়।

রাজ্যে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। এরপর থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনকালে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে কখনও কখনও মহার্ঘভাতা বকেয়া থেকেছে ঠিকই; কিন্তু বেতন কমিশনের মাধ্যমে বেতন কাঠামোর পরিবর্তনের সময় বকেয়া কিস্তিগুলি ধরে নিয়েই নতুন বেতনক্রম গঠিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ধারা বহন করে বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সাথে সাথে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বোড-কর্পোরেশন এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদান চালু করে। বামফ্রন্ট সরকার কর্মচারী-শিক্ষকদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিকে কোনোদিনই অস্বীকার করেনি, পরন্তু কিছু বকেয়া থাকলেও বছরে অন্তত দু'বার মহার্ঘভাতার কিস্তি প্রদান করেছে।

সেদিনের কর্মচারী সমাজ উপলব্ধি করেছিলেন পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া মহার্ঘভাতার অধিকার কখনও সুনিশ্চিত হতে পারে না।

২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ১১৫.৭৬ পয়েন্টে (২০০১ সালকে ১০০ ধরে) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে কার্যকরী হয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই সময় থেকেই (১৯৮২ = ১০০ ধরে) ৫৩৩ পয়েন্টের ভিত্তিতে বেতন কাঠামো নির্ধারিত হয় এবং তা ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে চালু হয়। ২৭ মাসের বকেয়া আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে দেওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৩৩ মাসে বামফ্রন্ট সরকার ৮ কিস্তিতে মোট ৩৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান করে। ২০১১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১০ শতাংশ (মোট বকেয়া ১৬ শতাংশ) মহার্ঘভাতা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার জন্য দিয়ে যেতে না পারলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান ভোট-অন-অ্যাকাউন্টে করা হয়েছিল।

রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কর্মচারীদের ন্যায্য ডিএ নিয়ে নানা ছলচাতুরি করে চলেছে এবং অর্জিত অধিকারকে অস্বীকার করছে। ডিএ সরকারের দয়ার দান, সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। অথচ ডিএ কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার। ২০০৯ সালের রোপা (রিভিউ অব পে এন্ড একাউন্ট) বিধিতে সর্বভারতীয় মূল্য সূচকের ভিত্তিতে বছরে দু'বার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। রোপা ২০০৯-এর আদেশনামা নং ১৬৯০-এফ এবং ১৬৯২-এফ তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ তা উল্লেখ করা হয়। বর্তমান রাজ্য সরকার তাকে উপেক্ষা করে কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে এবং প্রতিবাদে ধারাবাহিক সংগঠিত আন্দোলন, প্রতিবাদ, দাবি আদায়ের সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করতে রাজ্য সরকার স্বৈরাচারী ভূমিকা নেয়। কর্মচারীরা যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি উত্থাপন করতে না পারে তার কৌশল হিসাবে দাবি উত্থাপনে যুক্ত সংগঠনের কর্মী-নেতৃত্ব-কর্মচারীদের হয়রানিমূলক বদলি করা হয়। লক্ষ্য হচ্ছে সংগঠিতভাবে যাতে কোনো প্রতিবাদ-আন্দোলন না হয়। এর সাথে কেড়ে নেওয়া হয় ছুটির অধিকার। সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অনুসারে Right to leave-এর অধিকার থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক নির্দেশে আধিকারিকদের একাংশ কড়া ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়। অত্যন্ত পরিতাপের কথা হল, রাজ্য সরকার ও তার আমলা বাহিনী এইসব অধিকারকে নস্যাৎ করে চরম স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তদসত্ত্বেও কর্মচারী সমাজ সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করেই ধারাবাহিক লড়াইতে নিজেদের যুক্ত করে। ধর্মঘট সহ ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। চরম বঞ্চনার প্রতিফলন ঘটে ২০১৯ সালের রোপা বিধি থেকেই ডিএ শব্দটি বাতিল হয়ে যায়। এমনকি ১৯৭৭ সাল থেকে প্রাপ্ত বাড়িভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পাশাপাশি সর্বভারতীয় মূল্য সূচকের ভিত্তিতে পঞ্চম বেতন কমিশনে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় হারে বছরে দু'কিস্তি ডিএ, রোপা বিধির এই পটভূমিকে সামনে রেখে আদালতের দ্বারস্থ হয় কর্মচারী সংগঠন। ১ জুলাই, ২০০৯ থেকে ১ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত মূল্য সূচক অনুযায়ী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডিএ দেওয়া হয়নি। এই বকেয়ার অন্তত ৫০ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার দাবি নিয়ে ২০১৬ সালে মামলা দায়ের হয়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল বা SAT রায় দেয় ডিএ কর্মচারীদের অধিকার নয়, এটি রাজ্যের ইচ্ছাধীন। এর প্রতিবাদে ২০১৭ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়। ৩ আগস্ট ২০১৮ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বলে ডিএ কর্মচারীদের আইনগত বলবৎযোগ্য অধিকার। রাজ্য সরকার এই রায়ের রিভিউ পিটিশনে যায়। ২০২২ সালের ২০ মে কলকাতা ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ডিএ কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আইনগত মৌলিক অধিকার। ৯০ দিনের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে বকেয়া ডিএ। রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। ১৬ মে ২০২৫ সুপ্রিম কোর্ট ১ জুলাই ২০০৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট বকেয়া ডিএ-র অন্তত ২৫ শতাংশ ৬ সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার অন্তবর্তীকালীন নির্দেশ দেয়। ৪ আগস্ট, ২৫ (যেহেতু কর্মচারীরা ডিএ যুক্ত বেতন পেয়েছেন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত) মাসে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হলে ডিএ আইনী অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হবে। বকেয়া ডিএ প্রদানে রাজ্যের ঘাড়ে ৪১৭৭০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বোঝা চাপার অজুহাত খাড়া করে রাজ্যের কোমর ভেঙে যাওয়ার যুক্তি খাড়া করা হয়। কিন্তু এই আইনী লড়াইয়ে রাজ্য কোষাগার থেকে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা আটকাতে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয় না!

মহামান্য সর্বোচ্চ বিচারালয় AICPI-এর ভিত্তিতে ডিএ Legally enforceable right বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। আজকে যদি একে রূপায়ণ করতে হয় তাহলে সর্বস্তরের কর্মচারীর সম্মিলিত সংগ্রাম জরুরি। আইনের মাধ্যমে অনেক অধিকার অর্জন করা গেলেও তা জনগণের জন্য কার্যকরী হয় না, যদি না মানুষ সম্মিলিত ভাবে রাস্তায় অবতীর্ণ হয়। ইতিহাসে এরকম অসংখ্য নজির আছে। সুতরাং এই ঐতিহাসিক রায়কে বাস্তবে কার্যকরী করতে হলে সমগ্র শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগঠিত করতে উপযুক্ত গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল দরকার। পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে জনগণের নস্যাৎ হয়ে যাওয়া অধিকারগুলি অর্জনের সংগ্রাম নানাভাবে বিভাজনের অপকৌশল সত্ত্বেও ক্রমশ বেগবান হয়ে উঠছে। সেই সংগ্রামী জনগণের সমর্থনকে পাথেয় করেই সমস্ত অংশের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ কার্যকর করাতে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জরুরি—এটা আজ সময়ের আহ্বান। কার্যকরী রোপা ২০১৯-এর রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশ ও বকেয়া ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবিতে সর্বোপরি অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণের দাবিতে ধারাবাহিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জরুরি। এই সংগ্রাম কেবলমাত্র কর্মচারীর নিজস্ব সংগ্রাম নয়, সমস্ত অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সেই মহান সংগ্রামে নিজেদের যুক্ত রাখতে হবে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

সংগ্রামী হাতিয়ার—লড়াইয়ের হাতিয়ার

শুরু করে। প্রচারিত হতে থাকে বালুচিস্তান স্বাধীন হয়ে গেছে। এইভাবে মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছে। ক্রোধের পণ্যায়ন ঘটছে মিডিয়ার মধ্য দিয়ে। গত লোকসভা ভোটের ফল বের হবার ঠিক আগের দিন মিডিয়াকুল শীৎকার করেছে বিজেপি ৪০০-এর বেশি আসন পেয়েছে বলে। অথচ ফলাফলে দেখা গেল বিজেপি পেয়েছে ২৪০টি আসন। এভাবে মানুষকে এক অলীক বাস্তবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান মিডিয়া, পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রকৃত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে মানুষ। এক ধরনের "Hollow men"-এ পরিণত হচ্ছেন তাঁরা। তাঁর জীবন-জীবিকার সঙ্কটের প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। দেশের অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতাবলম্বী মানুষকে তাঁর সমস্যার মূল কারণ বলে তাঁর কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। ফলে সঙ্কটের প্রকৃত কারণ যে দেশের শাসকগোষ্ঠী, তাদের পরিচালিত নব্য-উদারনীতি আড়ালে চলে যাচ্ছে।

একই সঙ্গে Consent Manufacturing-এর স্বার্থে কাজ করে চলেছে বর্তমান মিডিয়া। বিগত শতকের ৯০-এর দশকে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারীকরণের স্বার্থে সেগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালিয়ে মিডিয়া জনমত তৈরী করেছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির ঢালাও বেসরকারীকরণে। নোটবন্দীর পক্ষে সহমত তৈরী করেছে মিডিয়া। একইভাবে একনায়কতন্ত্রী দেশনায়কের পক্ষেও সম্মতি নির্মাণ করছে মিডিয়া। শাসকশ্রেণীর মতামতকেই জনগণকে গলাধঃকরণ করিয়ে জনগণের মতামতে পরিণত করবার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মিডিয়া।

এইরকম একটা সময়ে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে সাঁতার কাটছে আমাদের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক ও অন্যান্য দাবিদাওয়ার সপক্ষে মত গড়ে তোলার জন্য নিরলস প্রচারক ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত ৫০ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। সংগঠনও পরিস্থিতি নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় সংগঠনের বিভিন্ন পদক্ষেপকে কর্মচারীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। অর্থনীতিবাদের বাইরে বেরিয়ে কর্মচারীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে আমাদের মুখপত্র। নির্দিষ্ট বাম মতাদর্শ দিয়ে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের গুরুতর দায়িত্ব পালন করেছে। ৯০-এর দশকে ভারতে নব্য-উদার অর্থনীতি চালু হওয়ার ফলে শ্রমজীবী মানুষ ও কর্মচারী সমাজের উপর যে ব্যাপক আক্রমণ নেমে এসেছে সে সম্পর্কে কর্মচারীদের সজাগ ও সতর্ক করতে লাগাতার বিশ্লেষণ মূলত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে হাতিয়ার-এ। নয়া পেনশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল সংগ্রামী হাতিয়ার। আজও সেই একই ভূমিকা নিয়ে চলেছে হাতিয়ার। কর্পোরেট কম্যুনাল আঁতাতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্যতম হাতিয়ার সংগ্রামী হাতিয়ার। বাংলাদেশ, মুর্শিদাবাদ হয়ে কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী হামলাকে কেন্দ্র করে মূল স্রোতের সংবাদ মাধ্যম যখন বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে সারা দেশজুড়ে, ঠিক তখনই এই ঘটনাগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করে শাসকশ্রেণীর স্বার্থকে উন্মোচিত করে দিয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ার। শ্রমকোড লাগু করার জন্য বিগত পাঁচ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শাসকশ্রেণী। কিন্তু তাকে রুখে দেবার ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারী সমাজ যে লড়াই চালাচ্ছে তার অন্যতম শরিক সংগ্রামী হাতিয়ার।

৫৩তম গ্রাহকবর্ষে সমস্ত কর্মচারী বন্ধুদের কাছে গ্রাহক হবার আবেদন নিয়ে পৌঁছোতে হবে আমাদের। সঠিক সময়ে সংগ্রামী হাতিয়ার পৌঁছে দিতে হবে গ্রাহকদের হাতে। লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রাহক যেন পাঠকে পরিণত হয়। ৫৩তম গ্রাহকবর্ষের প্রাক্কালে এটাই আমাদের অঙ্গীকার। □

প্রণব কর

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৫০ বছর—অজেয় ভিয়েতনাম

মানস দাস
সভাপতি
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

- □ এই দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অসামান্য ঘটনা কি বলে তোমার মনে হয়?
- ● ভিয়েতনামের যুদ্ধ—স্যার
- □ এটা কি চাঁদে পা রাখার চেয়েও উল্লেখযোগ্য?
- ● আমি তাই মনে করি—স্যার
- □ তুমি কেন এটা মনে করো?
- ● আসলে চাঁদে পা রাখা... দেখুন এটা আমাদের কাছে পুরোটা অপ্রত্যাশিত ছিল না... আমরা জানতাম এটা কখনো ঘটবেই... মহাকাশযান---মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নতি... আমরা জানতাম এটা হওয়ার ছিল... আমি বলছি না এটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য নয়... এটা ঘটনা যে ওরা চাঁদে পা রেখেছিল।
- □ তুমি কি মনে করো ভিয়েতনামের যুদ্ধ অপ্রত্যাশিত?
- ● শুধু যুদ্ধ নয়... যেভাবে ভিয়েতনামী জনগণ তাদের অসাধারণ শক্তি দেখিয়েছে... সাধারণ মানুষ, কৃষক এবং কেউ জানতো না এই অতিমানবীয় ক্ষমতা তাদের মধ্যে আছে... এটা কোনো প্রযুক্তির বিষয় নয়... এটা কেবলমাত্র মানুষের সাহস যা আমাদের বিস্ময়ে দম বন্ধ করে দিয়েছে।
- □ তুমি কি কমিউনিস্ট?
- ● আমি মনে করি না ভিয়েতনামের প্রশংসা করার জন্য কোনো পক্ষ নিতে হবে।
- □ এটা আমাদের প্রশ্নের উত্তর হলো না---তুমি এবার আসতে পারো।

ষাটের অশান্ত দশকের পশ্চিমবঙ্গ। চাকরি নেই, চারিদিকে আন্দোলন আর অত্যাচারের দিনলিপি। একটি চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে ঢুকে ইংরেজীতে কথোপকথনের এটি বাংলা অনুবাদ।

এই ইন্টারভিউটি ১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিনেমার একটি অংশ। যথারীতি চাকরিটি ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় অভিনীত নায়কের হয়নি!

ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী ভিয়েতনাম সংহতি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছিল সেই দেশে মার্কিন সেনাবাহিনীর নির্মম অত্যাচার আর নির্বিচারে মানুষ খুন। সে সময় শুধু সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে নয়, উৎপল দত্তের নাটক 'অজেয় ভিয়েতনাম', সাধন গুহ-র গান, কৃষ্ণ ধরের কবিতা সহ বহু নাটক, গান রচিত হয়েছে কলকাতায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তখন উদ্বেলিত এ শহর।

১৯৬০-৭০-এর দশক---'তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম' স্লোগানে উজ্জ্বল কলকাতা। ভারতবর্ষ বরাবরই ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের পাশে থেকেছে। কিন্তু ভিয়েতনামের প্রতি সংহতিতে সবচেয়ে আন্দোলিত ছিল গণআন্দোলনের পীঠস্থান কলকাতা।

১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর হো-চি-মিন-এর নেতৃত্বে হ্যানয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। ঐদিনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম লগ্নে জাপান আত্মসমর্পণ করে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী ও ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের জন্য ব্রিটিশরা ইঙ্গ ভারতীয় সেনা পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলে, প্রতিবাদ করে জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। পরাধীন দেশে ১৯৪৫-এর ২৫ অক্টোবর পালিত হয় 'ইন্দোচীন দিবস'। ভিয়েতনামে ফরাসী আগ্রাসনের প্রতিবাদে স্বাধীনতার আগে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে ১৯৪৭ সালের ২১ জানুয়ারি পালিত হয় 'ভিয়েতনাম দিবস'। সংহতি জানায় AITUC। কলকাতায় ধর্মঘট ভাঙতে ঐদিন পুলিশ গুলি চালালে স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র সুখেন্দু বিকাশ নাথ এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ধীররঞ্জন সেন প্রাণ হারান। গুলিতে আহত ছাত্র রণমিত্র সেন পরে দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় সাব এডিটর হন। ১৯৫৮ সালে হো চি মিন কলকাতা সফরে এলে রণমিত্র সেনের সাথে দেখা করেন।

১৯৬৮ সালের ২০-২২ নভেম্বর তৎকালীন বিশ্বব্যাঙ্ক সভাপতি এবং প্রাক্তন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব, ভিয়েতনাম যুদ্ধে কুখ্যাত রবার্ট ম্যাকনামারার সফর উপলক্ষে 'গো ব্যাক ম্যাকনামারা' শ্লোগানে, বিক্ষোভে উত্তাল ছিল কলকাতা। কলকাতা বিমানবন্দর ঘিরে ফেলা হয়েছিল তৎকালীন ছাত্রনেতা সুভাষ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সেই ঘটনা মাইলস্টোন হয়ে আছে। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৫-এর ৩০ এপ্রিল---যেদিন দক্ষিণ ভিয়েতনামের সায়গন মুক্ত হয়, সেই দিন পর্যন্ত কলকাতায় একটানা নিয়মিত ভিয়েতনামের প্রতি সংহতি জানিয়ে কর্মসূচী পালিত হয়। সংহতি আন্দোলনের দিক থেকে যা নজিরবিহীন। ১৯৭৬ সালের ২ জুলাই উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত হয়ে এক হয়। ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের রাজধানী হ্যানয় এবং সায়গনের নাম হয় হো চি মিন সিটি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে অতিমানবীয় লড়াইয়ে পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত, এ লড়াই এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে ভূমিকা আমাদের পূর্বসূরীরা প্রতিপালন করে এসেছে—তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

২

ভিয়েতনাম সম্ভবত একমাত্র রাষ্ট্র, যে দেশের জনগণ চীন, জাপান, ব্রিটিশ, ফ্রান্স সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন এবং দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের বিরুদ্ধে একটানা লড়াই করে জয়ী হয়েছে। সমাজতন্ত্র গঠন করেছে। ১৮৮৪ সালের আগে অবধি ভিয়েতনাম ছিল চীনের অধীন, তারপর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কবলে ভিয়েতনাম পরিণত হয় একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশে। ১৯৪৪-এ হো চি মিন সহযোদ্ধাদের খোলা চিঠিতে জানান, 'মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই আমাদের দেশের মানুষ মুক্তি লাভ করবে'। ঐ বছর ডিসেম্বরে গঠিত হয় ভিয়েতনাম মুক্তিসেনা। ভিয়েতনামের শাসনভার ফরাসীদের থেকে জাপানীদের হাতে চলে যায়। আর জাপানীদের হটিয়ে, বাও দাই-এর পুতুল সরকার হটিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

মার্কিন হানাদারেরা হটে গেলে
গড়বো দেশ আরো, আরো সুন্দর করে
ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ
বিরোধী যুদ্ধের সেনাপতি হো চি

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সংঘটিত "মাই লাই গণহত্যা"

শেষের মুহূর্তে, ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর এশিয়ার বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় হো চি মিনের নেতৃত্বে। রাজধানী হ্যানয়ের 'দিন স্কোয়ারে' দশ লক্ষ দেশবাসীর সামনে হো চি মিন রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নেন। কিন্তু মাত্র ৪৪৫ দিন পর ফরাসী ষড়যন্ত্রে আবার বিপ্লবী সরকার পিছু হটে আত্মগোপন করে। ১৯৪৬, ২০ ডিসেম্বর ভয়েস অফ ভিয়েতনাম রেডিও থেকে হো চি মিন দেশবাসীকে বলেন,

'... দেশবাসীগণ রুখে দাঁড়ান! পুরুষ ও মহিলা, বৃদ্ধ ও যুবক, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতামত এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে সমস্ত ভিয়েতনামবাসীকেই পিতৃভূমি রক্ষা করার জন্য ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। যাঁদের বন্দুক আছে, তাঁরা বন্দুক ব্যবহার করবেন; যাঁদের তলোয়ার আছে তাঁরা তলোয়ার ব্যবহার করবেন; যাদের তলোয়ার নেই, তাঁরা কোদাল, নিড়ানি বা লাঠি ব্যবহার করবেন। প্রত্যেকেই ঔপনিবেশিক শক্তির বিরোধিতা করবেন।' শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধ।

ততদিনে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠিত করেছে। ২০০০০ ভিয়েতনামীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয় চীন সীমান্তে। সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার হয়। ফরাসীদের বিরুদ্ধে গেরিলা বাহিনীর লড়াই তীব্রতর হয়। ১ মে থেকে শুরু হয় দিয়েন বিয়েন ফু লড়াইয়ের শেষ পর্যায়। ১৯৫৪ সালে ২১ জুলাই জেনেভা চুক্তি হয়। ইন্দোচীন যুদ্ধের সমাপ্ত হয়। ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ নিয়ে উত্তর ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। ফরাসী পতাকা নামিয়ে লাল পতাকা উড্ডীন হয় দিয়েন বিয়েন ফুর মাথায়। দক্ষিণ ভিয়েতনাম আলাদা হয়ে পুঁজিবাদী দেশ হিসাবে থেকে যায়।

চৌ এন লাই-এর অনুরোধে হো চি মিন ভিয়েতনামকে সাময়িক অস্থায়ী সীমানা সপ্তদশ অক্ষরেখা বরাবর দু'ভাগে ভাগ করতে রাজী হন।

শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের অবিভক্ত ভিয়েতনামের জন্য লড়াই!

৩

থাকবে পাহাড়, থাকবে নদী
থাকবে মানুষ নিরবধি;

মিন সংযুক্ত ভিয়েতনাম দেখে যেতে পারেননি। ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ প্রয়াত হন হো চি মিন। মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে থেকে তিনি ইচ্ছাপত্র লিখতে শুরু করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্রে যুদ্ধ জয়ের পর দেশ গঠন নিয়ে ভাবনা বিবৃত হয়েছে ওপরের পদ্যাংশে। তাঁর গোটা জীবন সমর্পিত হয়েছিল এক মুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনামের জন্য। তাঁকে সম্মান জানিয়ে বলা হত 'বাক হো' (চাচা হো)। ১৯ মে ১৮৯০ সালে হোয়াঙ ট্রু গ্রামে যখন তার জন্ম হয় তখন তাঁর নাম রাখা হয় নগুয়েন সিন কুঙ্গ (Nguyen Sing Cung) কিন্তু পরবর্তীকালে শত্রুপক্ষের চোখে ধুলো দিতে ১৭০টির বেশি নাম ব্যবহার করেন হো চি মিন। কখনো রাঁধুনির জোগাড়ে, কখনও চিত্র শিল্পী, কখনও থালাবাসন মাজার কাজ, খবরের কাগজের হকার, কখনও শিক্ষকতা করেছেন তিনি। সারা জীবনে ১২টি এই ধরনের পেশায় যুক্ত থাকতে বাধ্য হয়েছেন। প্রায়সময়ই পাশপোর্ট ভিসা ছাড়াই ছদ্মবেশে ২৮টি দেশে গিয়ে ভিয়েতনামের মুক্তির জন্য জনমত গড়ে তোলেন। ২৭ বছর বয়সেই তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। ফ্রান্সে গিয়ে নাম নিয়েছিলেন নগুয়েন আই কুয়োক, ১৯১৭-র শেষের দিকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড ঘুরে ফ্রান্সে যান। দেশে দেশে ভিয়েতনামে ফরাসী শাসকের বর্বরতার কথা প্রচার করেন। মার্কসের নাতি লঙগেটের ওয়ার্কার্স লাইফ পত্রিকায় যুক্ত হন। আই কুয়োকের লেখা সারা পৃথিবীর শ্রমিকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নগুয়েন আই কুয়োক। কমিন্টার্নের নির্দেশে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সোভিয়েত যান, তখন তাঁর নাম ত্রাণ ভাঙ্গ। ১৯২৪-এ ইন্দোচীনে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ক্যান্টন আসেন তখন তার নাম লি থুই। আবার পার্টির নির্দেশে ফেরেন ফ্রান্সে। ফরাসী সরকার তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ১৯৩০ সালে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি, পরে ইন্দোচীন কমিউনিস্ট পার্টি। মাঝে গ্রেপ্তার হন হংকং-এ, এমনকি জেলে নগুয়েন আই কুয়োকের যক্ষ্মায় মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪০ সালের ২২ জুন ফ্রান্স, জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে জেনারেল গিয়াপ চীন ভিয়েতনাম সীমান্তে গেরিলা শিবিরে যোগ দিয়েছেন। আই কুয়োক, হো চি মিন ছদ্মনামে চীন ঘুরে ৪০ মাইল হেঁটে পৌঁছোন প্যাক বো গুহায়। জোরদার হয় ভিয়েতনাম মুক্তির জন্য গেরিলা লড়াই। প্রথমে ফরাসী, তারপর জাপানীদের বিশ্বযুদ্ধে হারার আগে, কিছুদিন তাঁদের বিরুদ্ধে। প্যাক বো গুহায় তার লেখা কবিতা—

'সকালটা নদীর ধারে, রাত্রি কাটে গুহায়
আধপেটা আহার জোটে, তবু তৈরী
থাকি সদাই।
স্নিগ্ধতার মাঝে তর্জমা করি দলের
ইতিহাস
এ রোজনামচা খাঁটি বিপ্লবীর-ই'

৪

দক্ষিণ ভিয়েতনামে তখন আমেরিকা, বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে আরো দখলদারি বাড়াতে শুরু করেছে। বাও দাই নিযুক্ত নগু দিন দিয়েম ছিলেন অবিবাহিত, খামখেয়ালী, পাগলাটে এবং তীব্র কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। শাসনভার কার্যত চালাতেন ছোটো ভাই নগু দিন ন্যু ও তাঁর স্ত্রী মাদাম ন্যু। মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাবার জন্য মাদাম ন্যু 'ড্রাগন লেডি' নামে কুখ্যাত ছিলেন। আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামের উপর আক্রমণ বৃদ্ধি করে। জেনেভা চুক্তির পর দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তি সংগ্রাম চালানোর উদ্দেশ্যে প্রায় ৯০ হাজার মানুষ উত্তর ভিয়েতনামের সীমান্তে এসে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে যায়, ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে। কিন্তু কিয়েন কন প্রদেশে অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

২০ ডিসেম্বর ১৯৬০, আনুষ্ঠানিক ভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে ওঠে। ১৯৬৩-তে মে-মাসে হু'তে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের জমায়েতে পুলিশ গুলি চালিয়ে এক মহিলা সহ আট জনকে হত্যা করে। প্রতিবাদে কয়েকশো বৌদ্ধ সায়গনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে। আমেরিকা কৌশল করে দিয়েমের ওপর সমর্থন তুলে ছাপ্পা ভোটে নির্বাচন জিতিয়ে আরেকটা পুতুল সরকার বসিয়ে দেয়।

১৯৫৪ থেকে ১৯৬৩ অবধি দক্ষিণ ভিয়েতনামে ৯০০ জেলখানা তৈরি হয়, বন্দি করে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষকে। ১ লক্ষ ৬০ হাজার ভিয়েতনামী খুন, ১৬ হাজার মহিলা ধর্ষিতা হয়। বোমা বর্ষণে বিকলাঙ্গ হয় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার নরনারী। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৫ অবধি এক দশকে মার্কিনীদের যুদ্ধাভিযানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ও ফিলিপিনস নিয়ে গঠিত মিত্রশক্তি দুই দেশের ছোট্ট এলাকার মধ্যে ৭.৮৫ মিলিয়ন টন বোমাবর্ষণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যত বোমা বর্ষণ হয়েছে এটা ছিল তার তিন গুণ। ৬৪০টি হিরোশিমা পারমাণবিক বোমার সমান। এখনো ভিয়েতনামে জমি চাষ করতে গিয়ে বিস্ফোরণ না হওয়ায় বোমায় মানুষের মৃত্যু ঘটে। নাগাড়ে কার্পেট বোম্বিং-এ বহু জমির রাসায়নিক গুণাবলী বিনষ্ট হয়ে আছে।

মুক্তি ফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টেট আক্রমণ শুরু হয় ৩১ জানুয়ারি, ১৯৬৮। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অফিস দখল নেয় ভিয়েত কং বাহিনী। হতাহত ৩০ হাজার অতিক্রম করে।

৩১ মার্চ, ১৯৬৮ মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কতম গণহত্যা সংগঠিত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 'মাই লাই'-তে। ৫০০ নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষকে শিশু, মহিলা সহ নির্বিচারে হত্যা করা হয়—মহিলাদের গণহারে ধর্ষণ করা হয়। ঘরে বাইরে---সারা পৃথিবী জোড়া বিক্ষোভে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনসন শান্তি বৈঠকে বসতে রাজি হন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নিক্সনের সময়ে দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সেনা ফিরিয়ে আনা শুরু হয়। ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৩-এ ভিয়েতনামে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্যারিসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু দু'বছর ধরে সে চুক্তি কার্যকর না হওয়ায় ১৯৭৫ সালে মার্চ মাসে গেরিলা বাহিনী রাজধানী সায়গন ঘিরে ফেলে। পুতুল সরকারের রাষ্ট্রপতি থিউ, প্রধানমন্ত্রী কী এবং অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। ২৯ এপ্রিল ১৯৭৫, গোটা দক্ষিণ ভিয়েতনাম বিপ্লবীদের দখলে চলে যায়।

৩০ এপ্রিল, ১৯৭৫ চীনের সাজোঁয়া ট্যাঙ্ক ৩৯০ আর সোভিয়েতের ট্যাঙ্ক ৮৪৩ উত্তর ভিয়েতনাম থেকে হাজার দেড়েক কিমি পেরিয়ে সায়গনের রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ঐতিহাসিক মুহূর্ত, ট্যাঙ্ক ৮৪৩-এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন বুই কুয়াং থান ট্যাঙ্ক থেকে নেমে জাতীয় মুক্তি মোর্চার পতাকা হাতে উঠে পড়লেন প্রাসাদের চূড়ায়। রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের ওপর জাতীয় মুক্তি মোর্চার পতাকা ওড়ার দৃশ্যটি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভিয়েতনামের সংযুক্তিকরণের প্রতীক হয়ে মুক্তিকামী বহু মানুষের মনের গভীরে স্থান করে আছে।

রাষ্ট্রদূতের অফিসের ছাদ থেকে আমেরিকার শেষ হেলিকপ্টার আর সায়গনের বন্দর থেকে শেষ জাহাজে আমেরিকান সৈন্যদের হুড়োহুড়ি করে পালানোর দৃশ্যটি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চরম পরাজয়ের স্মৃতি হিসাবে আজও উজ্জ্বল। বছর খানেক বাদে ২ জুলাই ১৯৭৬-এ দুই ভিয়েতনামের সংযুক্তি হয়ে ভিয়েতনাম সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়; তার রাজধানী হয় হ্যানয় আর সায়গনের নাম হয়ে হয় হো চি মিন সিটি।

৫

সারা পৃথিবীজুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দাদাগিরি আজও বহমান। আজ গাজায় ইজরায়েল-মার্কিন জোটের নির্মমভাবে গণহত্যা ভিয়েতনামের অত্যাচারের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে ঐতিহ্য আমরা বহন করছি, আজকে তাকে পুনরায় আমাদের জাগ্রত করতে হবে। ভিয়েতনাম প্রমাণ করেছে দুর্বল, সাধারণ মানুষের অদম্য সাহস—প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদেরও পরাজিত করতে পারে। ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার পঞ্চাশ বছর আমাদের এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে। □

হে মার্কেট আবহমান

উৎসর্গ মিত্র

মে দিবস ... পয়লা মে! সেই আবহমান কাল থেকেই উত্তর গোলার্ধে, বিশেষ করে ইউরোপে ছিল উৎসবের দিন... কঠিন শীতের পরে উষ্ণ বসন্ত আসার দিন। বরাবরই এই দিনটাকে মানুষ নেচে-গেয়ে-কেক কেটে পালন করে আসতেন তাঁদের নিজের মতো করে, যতদিন না সেই হে মার্কেটের ঘটনা ঘটলো...

হে মার্কেট ... দিনটা ছিল ৪ মে, সাল ১৮৮৬। দিনে আট ঘণ্টা করে কাজের দাবিতে বা আরও ভালো ভাবে বলতে গেলে দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজ না করার দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভরত কয়েক হাজার শ্রমিকের ওপর গুলি চালিয়ে নির্বিচারে খুন করেছিল 'শান্তি রক্ষা'র নামে সশস্ত্র মার্কিন পুলিশ। অজুহাত— কে বা কারা যেন তাদের ওপরে বোমা মেরে খুন করে ফেলেছে সাত জন পুলিশকে আর আহত করেছে বেশ কয়েকজনকে। কারা বোমা মেরেছে, সেটা ধরতে না পারলেও সেই পুলিশ কিন্তু সেদিন ধরতে পেরেছিল সকলের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ... কিছুদিন বিচারের নাটক করার পরে তাদের চার জনকে ফাঁসি দিয়ে তার পর থেমেছিল তারা।

১৮৮৯ সালে কমিউনিস্টদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসেই প্রস্তাব আনা হয় ১৮৮৬-কে স্মরণ করে পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর পয়লা মে তারিখকে বিশ্বের সব ক'টা ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠনগুলি তাদের 'দাবি দিবস' হিসেবে পালন করুক। তখনও পর্যন্ত আট ঘণ্টার কাজের দাবি স্বীকৃত হয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। সে কারণে প্রস্তাব আসে, সেই দাবি এবং শ্রমজীবী মানুষের ওপর অত্যাচার বন্ধের দাবিতেই মুখ্যত পরিচালিত হোক দাবি দিবসগুলি। ১৮৯১ সালে আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯০৪ সালে আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেস থেকে সিদ্ধান্ত হয় প্রতি বছর এই দিনটিকে 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালন করবার, তাদের দাবি এবং শপথের দিন হিসাবে পালন করবার। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সব দেশে এই দিনটি জাতীয় ছুটির দিন ... নানা নামে দিনটা পরিচিত সেই সব দেশে ... কোথাও 'শ্রমিক দিবস' হিসাবে, কোথাও 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসাবে, কোথাও বা অন্য কোনও নামে। কিন্তু যেখানে যে নামেই ডাকা হোক না কেন, এক কথায় সে 'মে দিবস', মহিমাও তার সব জায়গাতেই এক ... শ্রমিক সংহতির অনুভূতিও সব জায়গাতেই এক।

আসলে হে মার্কেটের ঘটনা শুধু মাত্রই একটা 'ঘটনা' ছিল না; এ ছিল এক গভীর চক্রান্তের পরিণতি। চক্রান্ত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে, চক্রান্ত মালিকদের স্বার্থের পক্ষে। যে সময়ে এই হে মার্কেটের ঘটনা ঘটেছিল, তখন পৃথিবীর সব জায়গাতেই, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের কাজের কোনও পরিবেশ ছিল না। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের কাজ করতে হতো কখনও কখনও ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের রাগ ক্রমশ বাড়ছিল এর বিরুদ্ধে। ১৮৮৪ সালে আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ 'ফেডারেশন অফ অর্গানাইজড ট্রেডস অ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়ন' শিকাগোয় তাদের জাতীয় সম্মেলন থেকে ঘোষণা করে আগামী ১৮৮৬ সালের পয়লা মে থেকে তারা কোথাওই আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবে না এবং সেই সিদ্ধান্ত পালিত হবে সে বছর পয়লা মে তারিখে সাধারণ ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে। সেই সময়ে সব জায়গার মতো আমেরিকাতেও সমাজতন্ত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছিল। তার ওপর এই ঘোষণা সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। তারা গোপনে সিদ্ধান্ত নেয় আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেওয়ার। কিন্তু যেহেতু শ্রমিকরা শান্তই ছিলেন বরাবর, সরকার সুযোগ পাচ্ছিল না আক্রমণ শানাবার।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মতোই শ্রমিকেরা পয়লা মে তারিখে বেরিয়ে এলেন কাজ ছেড়ে। রিপোর্ট বলছে, ওই দিন গোটা আমেরিকায় ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন ১৩,০০০ কারখানার ৩,০০,০০০ শ্রমিক, তার মধ্যে আন্দোলন কেন্দ্র শুধু শিকাগো শহরেরই ছিলেন ৪০,০০০! দিনের শেষে এই সংখ্যাটা দাঁড়ায় এক লক্ষে!! শ্রমিকেরা ঠিক করেন ৩ তারিখ তাঁরা বিজয় উৎসব পালন করবেন।

৩ তারিখ জমায়েত হলো কয়েক হাজার। এদিনও তাঁরা শান্তই ছিলেন, কিন্তু পুলিশ ধৈর্য রাখতে পারেনি আর। 'দেশ বিরোধী' বক্তৃতা হচ্ছে— এই অজুহাতে লাঠি চালাতে শুরু করে তারা। পালটা পাথর ছোঁড়েন শ্রমিকেরাও। পুলিশ এই সুযোগটাই খুঁজছিল। তারা গুলি চালাতে শুরু করলে দু'জন শ্রমিক মারা যান। সারা দেশে নিন্দা আর সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। শ্রমিকেরা সিদ্ধান্ত নেন পর দিন আরও বড়ো জমায়েত করে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করবেন তাঁরা। পুলিশ বোঝে আরও বড়ো ছুতোর দরকার তাদের।

৪ তারিখ আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত খারাপ। ফলে জমায়েত যেমন হওয়ার কথা ছিল, হয়নি— বড়ো জোর হাজার তিনেক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন সেই দিন। শান্ত অথচ দৃঢ়চেতা তাঁরা— সঙ্গে তাঁদের পরিবারের লোকজন। সভা যখন শেষের দিকে, তখন সরকারের দুই চর পুলিশকে প্ররোচিত করতে শুরু করে গুলি চালানোর জন্যে। পুলিশ অস্বীকার করে আর ঠিক এই সময়েই কে বা কারা যেন পুলিশের ওপর দুটো বোমা ছুঁড়ে পালিয়ে যায়— আজ পর্যন্ত তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। বোমায় পুলিশের সাত জন মারা যায় আর পুলিশের গুলিতে কত জন প্রাণ হারিয়েছিলেন সেই দিন, তার কোনও হিসেব পাওয়া যায় না। কোনও প্ররোচনা না দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে আন্দোলনের আট পরিচিত মুখকে। শুরু হয় বিচারের প্রহসন। শহরের ব্যবসাদারদের নিয়ে তৈরী হয় জুরি বোর্ড। আট জনকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ফাঁসি দেওয়া হয় চার জনকে— এলবার্ট পার্সনস, অগাস্ট স্পাইস, জর্জ এঙ্গেল আর এডল্ফ ফিশারকে। আরও এক জন, লুইস লিঙ্গ-এরও ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, কিন্তু তিনি অসম্মানের মৃত্যুর থেকে বরং আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। মুখের ভিতর বিস্ফোরক ঢুকিয়ে উড়িয়ে দেন নিজেকে)। বাকি সবাইকেই বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়, কিন্তু তত দিনে মার্কিন সরকারের চক্রান্তের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে গোটা বিশ্ববাসীর সামনে। স্বার্থে ঘা লাগলে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কতটা নীচে নামতে পারে, তা প্রমাণ হয়ে গেছে আরও এক বার।

হে মার্কেটের সেদিনের সেই ঘটনার পর দেখতে দেখতে কেটে গেছে একশো উনচল্লিশ বছর। এখন আর শ্রমজীবীদের পয়লা মে 'সিদ্ধান্ত করে' পালন করতে হয় না। পয়লা মে মানেই তাঁরা সমাবেশ করবেন, তাঁদের দাবি উত্থাপন করবেন, দাবি আদায়ের শপথ নেবেন। গোটা পৃথিবী জুড়েই এটা হয়ে আসছে। আজ পৃথিবীর ৬৬টা দেশ 'মে দিবস'-কে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছে, এমনকি আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘ (International Labour Organisation, *ILO*) পর্যন্ত এই দিনটিকে শ্রমিকদের সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার লড়াইয়ের স্বীকৃতি সূচক দিন হিসেবে পালন করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ''কিন্তু কেন?'' হে মার্কেটের ঘটনার এত দিন পরেও, এমনকি 'মে দিবস' পালনের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের এত দিন পরেও, আজও কেন পৃথিবী ব্যাপী শ্রমজীবীরা এই দিনটিকে পালন করতে সমান উৎসাহী? শুধু মাত্র হে মার্কেটকে স্মরণ করতে? কখনোই সেটা হতে পারে না। তাহলে কেন?

এর উত্তর পেতে গেলে আজকের পৃথিবীর দিকে একটু চোখ বোলানো দরকার। সোভিয়েত ব্লকের পতনের পর এখন বিশ্ব একমেরু। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য এখন নিরঙ্কুশ। পুঁজিবাদের অনন্য ধর্ম 'পুঁজির কেন্দ্রীকরণ'-এর প্রক্রিয়া এখন চলছে বিশ্ব জুড়ে। ফাঁকা মাঠ পেয়ে আরও বেশি মুনাফা আদায় করার স্বপ্নে মশগুল পুঁজিপতিরা। একের পর এক দেশের সরকারকে কব্জা করে, নিজেদের মনোমত আইন তৈরী করিয়ে ইচ্ছে মতো মুনাফার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু তাতেও সমস্যা তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন। আরও বেশি মুনাফা করতে গিয়ে, কম সময়ে আরও বেশি উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পুঁজিপতিরা যে 'অটোমেশন'-এর সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তা এখন চরম রূপ পরিগ্রহ করায় কায়িক শ্রমের পরিসর ক্রমশ কমছে। উপরন্তু কিছু দিন আগে গোটা পৃথিবীতেই নেমে আসা অর্থনৈতিক মন্দা এখনও পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে না পারায় ধনতান্ত্রিক দুনিয়া মুক্তি পেতে লোক নিয়োগ তো দূরস্থান, ব্যাপক হারে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ বেছে নিচ্ছে। এর প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে দুটো— এক, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমাগত কমছে, ফলে উৎপাদিত পণ্য বাজারে এলেও তা প্রায় অবিক্রিত অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে, অর্থাৎ যে মুনাফা পুঁজিপতিদের হওয়ার কথা ছিল, তা কিছুতেই হচ্ছে না এবং দুই, নিদারুণ কর্মী সংকোচনের পরে মুষ্টিমেয় যে ক'জন উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে টিকে যাচ্ছেন, তাঁদের ওপর চাপ পড়ছে সাংঘাতিক রকমের এবং সে চাপ সামলাতে গিয়ে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করেও তাঁরা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না— তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে তার থেকেও অনেক বেশি সময় ধরে এবং তার পরেও 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' নামক জোয়াল তাঁদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ফলে শ্রমিক অসন্তোষ কখনও কখনও বিস্ফোরণের চেহারা নিচ্ছে। পুঁজির সঙ্কট যত ঘনীভূত হচ্ছে, পুঁজির সঙ্গে শ্রমের দ্বন্দ্বও তত চওড়া হচ্ছে। এর থেকে নিস্তার পাওয়ার রাস্তা পুঁজিবাদের অন্তত জানা নেই।

পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠছে দেশে দেশে পুঁজিবাদীদের প্রতিষ্ঠিত বশংবদ সরকারগুলিও পুঁজিবাদীদেরই পথ অনুসরণ করায়। এক দিকে 'প্রভু'দের খুশি করতে তারা ধনীদের প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে দিচ্ছে, তাদের ঋণ মকুব করছে (যা আসলে জনগণেরই টাকা), ফলে সরকারের আয় যাচ্ছে কমে এবং অন্যদিকে সেই কম আয়ের মধ্যে সরকার চালাতে গিয়ে সরকারগুলি ব্যাপক ভাবে কর্মী সংকোচন করছে, সরকারী দপ্তরগুলিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছে, কর্মীদের অবসরকালীন প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করছে। ফলে সামাজিক ভাবেই মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে আরও বেশি। এক্ষেত্রে যত দিন যাচ্ছে, তথাকথিত 'হোয়াইট কলার লেবার' এবং 'ব্লু কলার লেবার'দের মধ্যে অর্থাৎ 'বাবু কর্মচারী' এবং 'কালিঝুলি মাখা' কর্মচারীদের মধ্যের ফারাক ক্রমশ কমে আসছে। এই চিত্র পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র। গুগল, ওয়ালমার্ট, আই বি এম, জেনারেল মোটরস, হোণ্ডা, হুণ্ডাই, কোডাক, সিমেন্স, ফোকসভাগেন বা ডেল-এর শ্রমিক-কর্মচারীদের যা অবস্থা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, জাপান, এমনকি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী দপ্তরের কর্মচারীদেরও এখন সেই একই অবস্থা।

শ্রমিক-কর্মচারীদের পৃথিবী ব্যাপী যে যে পরিস্থিতির কথা উপরে উল্লেখ করা হলো, আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও সেই একই সব কথা প্রযোজ্য। এ কথা অনিস্বীকার্য যে, স্বাধীন ভারতের সব কয়টা সরকারই ছিল আসলে পুঁজিপতিদের, কিন্তু এখন যারা সরকার চালাচ্ছে, তারা একেবারে 'বশংবদ'— দাসানুদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ তারা। ফলে 'কল্যাণকর' রাষ্ট্রের সব গুণেরই অবলুপ্তি এখানে ক্রমশ ঘটে চলেছে। সরকারের নিজস্ব ক্ষেত্র (এখন প্রায় অবলুপ্ত) ছাড়াও কৃষি, শিল্প, সার্ভিস সেক্টর— সর্বত্রই হাহাকার অবস্থা। সবচেয়ে আক্রান্ত শ্রমিকেরা। সরকারের দাস-মনোভাবের জন্যে প্রশ্রয় পেয়ে এমনিতেই এখানে মালিক পক্ষ তাদের ইচ্ছা মতো শ্রমিকদের ব্যবহার করে— সরকার বা প্রশাসন দেখেও দেখে না, তার উপর আবার আছে বছর বছর শ্রমিকদের নানা সুরক্ষামূলক আইনের পরিবর্তন। ফলে বঞ্চনার বিরুদ্ধে কোনও ক্রমে আদালতে যেতে পারলেও সুবিচার পাওয়ার আশা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর উপর আবার সরকার এখন তার বশ্যতার প্রমাণ রাখতে পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নিয়েছে 'শ্রম কোড'। এ ব্যাপারে কিছু বলার আগে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক—

এ বছর মার্চের মাঝামাঝি ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলার বাছেলি শহরে ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কর্মীরা তাঁদের কাজের জায়গায় ঢুকতে গিয়েই দেখলেন গেটের সামনে নোটিশ ঝুলছে আর তাতে লেখা আছে যে সেদিন থেকে কর্মীদের সবাইকেই ভিতরে ঢুকতে গেলে ফেস রিকগনিশন মেশিনে মুখ দেখিয়ে তারপর ঢুকতে হবে আর যারা সেটা করবে না, তাদের অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাঁরা কোনও কাজ পাবেন না। কর্মচারীদের ইউনিয়ন আপত্তি জানিয়েছিল, কর্মীরাও বেশ কিছুদিন মেশিনে মুখ না দেখিয়ে কাজে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনও কাজ দেওয়া হয়নি এবং সব দিনগুলিতেই তাঁদের 'অনুপস্থিত' দেখানো হয়েছে। ফলে তাঁরা কোনো বেতনও পাননি ওই দিনগুলির জন্যে। ইউনিয়নের বক্তব্য ছিল তাদের সাথে আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারা এমনকি কেন্দ্রের চিফ লেবার কমিশনারের কাছেও দরবার করেছিল, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

প্রশ্ন উঠতেই পারে যে সামান্য একটা ফেস রিকগনিশন মেশিন ব্যবহারের জন্যে এই বিরোধিতা কেন? এর উত্তর দুটো— প্রথমত, এই ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করে নেওয়ার কথা, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, কোনও কর্মস্থলে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব যদি থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেখানে 'কালেক্টিভ বার্গেনিং' বা যৌথ দর কষাকষিরও স্বীকৃতি থাকছে। কিন্তু এই ভাবে যদি ইউনিয়নকে এড়িয়ে গিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে সেই যৌথ দর কষাকষির স্বীকৃতিকেই বানচাল করে দেওয়া হয়। মূল আপত্তিটা এখানেই। ইউনিয়নের নেতারা দেখিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এ ধরনের প্রবণতা বাড়ছে। বাছেলি একা নয়, মানেসরের হণ্ডা, হুণ্ডাই বা সুজুকি কোম্পানী কিম্বা অধুনা বিলুপ্ত ভিডিওকন কোম্পানীর শ্রমিকদের ওপর মালিক গোষ্ঠীর অত্যাচারের কথা পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে। নিশ্চয় মনে আছে কী হয়েছিল সেই দিনগুলিতে কিংবা তার পরের দিনগুলিতে। নিশ্চিত করে বলা যায়, সবই হয়েছে সরকারের প্রশ্রয়ে এবং উদাসীনতায়। এই প্রশ্রয় এবং উদাসীনতাকে আইনী রূপ দিতেই তৈরি এবং পাশ করানো হয়েছে 'লেবার কোড' বা 'শ্রম কোড'কে। বাতিল করার চেষ্টা হচ্ছে বর্তমান শ্রম আইনকে। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে শ্রমিকের যাবতীয় অধিকার। চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করার।

দেশে করোনা আবহের মধ্যে চোরের মতো অতি দ্রুততার সঙ্গে পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল ঘৃণ্য চারটি 'লেবার কোড'কে। 'ঘৃণ্য' বলছি তার কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী মুষ্টিমেয় যে কয়জন পুঁজি-মালিকের কথায় ওঠাবসা করেন, এই লেবার কোড শুধুমাত্র তাদের স্বার্থই রক্ষা করবে দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থকে বলি দিয়ে। ঐ কয়জন পুঁজি-মালিকের সেবা করার বাসনা প্রধানমন্ত্রীর এতটাই উদগ্র যে, দেশের মানুষ যখন মারণ ভাইরাসের কবল থেকে জীবন বাঁচানোর জন্যে দিশাহারা হয়ে রয়েছেন, ঠিক সেই সময়টাকেই তিনি এই লেবার কোড পাশ করানোর জন্যে বেছে নিয়েছিলেন যাতে দেশের মানুষের কাছে এর বিরোধিতা করার মতো যথেষ্ট সুযোগ না থাকে! আইন পাশ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তা কার্যকর করা যায়নি প্রথমত সে সময় প্রায় সমস্ত কল-কারখানা বন্ধ থাকার জন্যে এবং দ্বিতীয়ত, ওই খারাপ সময়ের মধ্যেও মূলত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির লাগাতার বিরোধিতার জন্য। কিন্তু আজ সরকার মরিয়া যে কোনও মূল্যেই শ্রম কোড চালু করতে নইলে তার 'আনুগত্যে' আঁচড় পড়ে যাবে।

ভয়ংকর এই শ্রম কোড। এই কোড যদি চালু হয়ে যায়, তাহলে কোনও কারণের জন্যেই কোনও ভাবেই শ্রমিকেরা ধর্মঘট করতে পারবেন না, আদালতে যেতে পারবেন না। তাঁদেরকে সমস্যা নিয়ে যেতে হবে ট্রাইবুনালের কাছে, যা গঠিত হবে সরকারের মনোনীত সদস্যদের দ্বারা এবং যাতে থাকবে মালিক পক্ষের প্রতিনিধিও। সুতরাং এমন একটি জায়গায় শ্রমিকেরা তাঁদের সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হলে তার ফলাফল কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়। আরও ভয়ংকর হচ্ছে, এই শ্রম কোড শুধু শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য— এমনটা নয়, রাষ্ট্রপতির সিলমোহর পড়লে তা প্রযোজ্য হবে সরকারী-বেসরকারী সমস্ত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের প্রতিও। যৌথ দর কষাকষির অধিকার হারাবেন তাঁরাও। পৃথিবীর কোনও দেশের সরকার ভাবতেও পারেনি এমন কিছু করার কথা, যা ইতোমধ্যেই আমার দেশের সরকার করে ফেলেছে। যে কোনও মূল্যেই রুখতে হবে একে, নইলে মানুষের সম্মান নিয়ে বাঁচার অধিকার হারাতে হবে। সুতরাং দ্বন্দ্ব এখন চরমে। দেশ বাঁচাতে, দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে, এ দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে বাঁচাতে এই লড়াই জিততেই হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এখানে।

কোনও রকম 'দাক্ষিণ্যমূলক' প্রকল্প নয়— বেকারদের জন্যে আট ঘণ্টার কাজ এবং কর্মরতদের জন্যে কাজের অতিরিক্ত বোঝাকে আট ঘণ্টায় নামিয়ে আনাই এখন সময়ের দাবি, মানুষের অধিকার এবং এ কথা শাশ্বত যে, অধিকার যেচে কেউ হাতে তুলে দেয় না— তাকে আদায় করতে হয়, কেড়ে নিতে হয়। দেশ, কালের সীমা পেরিয়ে পৃথিবী ব্যাপী তাই লড়াই চলছে অধিকারের জন্যে। হে মার্কেটের বীর সেনানীরা তাঁদের এই লড়াইয়ের প্রেরণা কারণ আট ঘণ্টার কাজের দাবি আদায়ের লড়াই তাঁরাই শুরু করেছিলেন। এই কারণেই আজও প্রকাশ্যে হোক বা লুকিয়ে, শ্রমিক-কর্মচারীরা পালন করেন 'মে দিবস', উচ্চারণ করেন তাঁদের দাবি, শপথ নেন সেগুলো আদায় করার।

'মে দিবস' তাই আজ আর শুধু মাত্র ছুটির দিন নয়, নয় কোনও আনন্দ বা স্ফূর্তীর দিন। 'মে দিবস' আজ এক শপথের দিন আ-বিশ্ব শ্রমিক-কর্মচারীর কাছে। শপথ চক্রান্ত রোখার, শপথ মুক্তির দিকে এগিয়ে চলার। 'মে দিবস' এক দিন আদায় করে এনেছিল মানুষের আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিনোদন আর আট ঘণ্টা বিশ্রামের অধিকার। ফের সে অধিকার সঙ্কটে। 'মে দিবস' তাই আজও প্রেরণা যোগাচ্ছে শ্রমিককে এগিয়ে চলার। পুলিশের গুলি, বিচারের প্রহসন— কোনও কিছুই আটকাতে পারবে না তাঁদের। হে মার্কেটে শহীদ স্মরণে আজ যে স্মারক স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, তার গায়ে লেখা কথাগুলোই আজ তাঁদের এগিয়ে চলার প্রেরণা— THE DAY WILL COME, WHEN OUR SILENCE WILL BE MORE POWERFUL THAN THE VOICES YOU ARE THROTTLING TODAY। হ্যাঁ, তাঁরা বাঙ্ময় আছেন ... থাকবেনও চিরদিন! 'মে দিবস' জিন্দাবাদ!! □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান সহ অন্যান্য দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র

করেছেন। ঐ তাৎপর্যবাহী রায়ে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানে (এ.আই.সি.পি.আই অনুসারে) রাজ্য সরকারের আর্থিক অসচ্ছলতাকে কোনো আমল দেওয়া হয়নি এবং রাজ্যে ও রাজ্যের বাইরের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার সিদ্ধান্তকে বৈষম্যমূলক হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আপনার আহ্বানে অনুষ্ঠিত মহাকরণের রোটান্ডায় আয়োজিত দ্বিতীয় সভায় (১৬ আগস্ট, ২০১১) আমরা কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া মহার্ঘভাতার দাবি জানিয়েছিলাম এবং আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে এ কথাও ঘোষণা করেছিলাম মহার্ঘভাতার দাবি পূরণ রাজ্য সরকার যদি আর্থিক ক্ষমতার বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করলে আমরা সংগঠনগত ভাবে আপনার আন্দোলনের পাশে থাকব, কিন্তু পূর্বকার আপনার কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়নি।

এরপর বিগত বছরগুলিতে আমরা বিরামহীনভাবে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে (সর্বভারতীয় মূল্য সূচকের ভিত্তিতে) আপনাকে বারবার স্মারকলিপি দিয়েছি এবং আপনার সাথে সাক্ষাতে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। নবান্নে গিয়ে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থীও থেকেছি। আমাদের যন্ত্রণা আপনি শোনেন নি শুধু নয়, নিয়ম বহির্ভূতভাবে সংগঠনের কর্মী সংগঠকদের রাজ্যের দূর-দূরান্তে বদলি করেছেন। শুধু মহার্ঘভাতাই নয়, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলির কোনো সুমীমাংসা হয়নি।

সুপ্রচুর কাজের চাপে ও জনগণের ন্যায্য প্রাপ্য পরিষেবাদি সুনিশ্চিত করতে লোকসেবা আয়োগ বা অন্য কোনো বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহকে দিয়ে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ স্থায়ীভাবে পূরণের জন্য আমাদের আর্জি আজও উপেক্ষিত থেকেছে। রাজ্য প্রশাসনের প্রায় সকল শূন্য পদে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের যে নীতিগত সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে তার দ্বারা স্বচ্ছভাবে সকল পদে নিয়মিত নিয়োগের দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। এর পরিণাম রাজ্য প্রশাসনে এক বিপুল পরিমাণ কর্মচারী চুক্তিতে নিযুক্ত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে চুক্তিতে নিযুক্ত সকল স্তরের কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের দাবি জানিয়েছি। পুনর্বার সোচ্চারে এই দাবি জানাচ্ছি। উপরিউক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশাত্মক নীতি সমকাজে সমবেতন প্রদানের রায় মেনে চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের ন্যায্য বেতনভাতার দাবি আমরা বারে বারে উত্থাপন করলেও তা উপেক্ষিত থেকেছে।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই পে কমিশনের সম্ভাব্য শর্তাবলী প্রকাশের মুখে। আমরা এই রাজ্যের ক্ষেত্রে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে আমরা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানাতে চাই যে পঞ্চম বেতন কমিশনের বকেয়া এবং মহার্ঘভাতা (কেন্দ্রীয় হারে সর্বভারতীয় মূল্য সূচকের ভিত্তিতে) দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে রোপা রুলস্ ২০১৯ কার্যকরী হওয়ার দিন থেকে বকেয়া এবং প্রাপ্য (কেন্দ্রীয় হারে সর্বভারতীয় মূল্যসূচকের ভিত্তিতে) ৩৭ শতাংশ মহার্ঘভাতা অনতিবিলম্বে প্রদান করার জন্য আপনি সবিশেষ উদ্যোগ নিন।

ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট এখানো প্রকাশিত হয়নি, এ সম্পর্কে স্বীকৃত সংগঠনগুলিকে রিপোর্টের কপি প্রদানের দাবি করছি।

আমরা পুনরায় আপনার কাছে দৃঢ়ভাবে দাবি জানাচ্ছি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতার বকেয়া ও প্রাপ্য অংশের অন্তত ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। সরকারের নিজের কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের দায়বদ্ধতা মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত ব্যক্ত করেছেন, তাকে মর্যাদা দিন।

আশা করি, অন্যান্য জরুরি অমীমাংসিত দাবিগুলির নিষ্পত্তি বিধানের জন্য আপনি সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করুন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করে মহার্ঘভাতার বকেয়া প্রদান সহ অন্যান্য দাবিতে ৩ ও ৪ জুন প্রতিটি দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচী

হাওড়া

জলপাইগুড়ি

আলিপুরদুয়ার

পূর্ব বর্ধমান

জেলায় জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচী

কর্মী সভা, আরামবাগ, হুগলী

মেদিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, পুরুলিয়া

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত

কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক কাজল সরকার, যুগ্ম সম্পাদক শুভাশীষ চক্রবর্তী, নদীয়া জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুধন্য সরকার, নদীয়া জেলা সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক এস. এম. সাদী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক বাদল দত্ত।

সভার শুরুতেই একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের লোগো উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। পরবর্তীতে অভ্যর্থনা কমিটির প্রস্তাব পেশ করেন জেলা সম্পাদক কাজল সরকার। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক বাদল দত্তকে সভাপতি, প্রদীপ রাহাকে কার্যকরী সভাপতি, কাজল সরকারকে সম্পাদক, শুভাশীষ চক্রবর্তীকে যুগ্ম সম্পাদক ও উৎপল বিশ্বাসকে কোষাধ্যক্ষ করে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটির প্রস্তাব পেশ করেন তিনি, যেখানে প্রাক্তন নেতৃত্বদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য করা হয় ও জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতির নেতৃত্ব এবং জেলার বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃত্বদের যুক্ত করা হয়। এছাড়াও সম্মেলনকে সফল করতে ১০টি মূল উপসমিতি ও ১টি বিশেষ উপসমিতি (পরিকাঠামো উপসমিতি) মোট ১১টি উপসমিতির আহ্বায়কদের নামের প্রস্তাবও তিনি পেশ করেন। তিনি বলেন ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম রাজ্য সম্মেলন পরবর্তীতে চারদশক অতিক্রম করে নদীয়া জেলায় পুনরায় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের দায়িত্ব দেওয়ায় তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিনন্দন জানান। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত লোগো বিষয়ে তিনি বলেন এই লোগোর মধ্য দিয়ে নদীয়া জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যেখানে ৫০০ বছর আগের নবদ্বীপ শহরে শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্যোগে জাতধর্মের উর্ধ্বে উঠে, জনমানসের নগরকীর্তন প্রাধান্য পেয়েছে। পরিবার পরিজন ও সদস্য বন্ধুদের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছিল লোগোর ভাবনাকে রূপ দেওয়ার, তাদের মধ্য থেকেই এই লোগোটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। জেলা সংগঠনের প্রাক্তন নেতৃত্ব যাঁরা সপ্তম সম্মেলনের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ সম্মেলনকে সফল করতে সহায়ক হবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অভ্যর্থনা কমিটির প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নদীয়া জেলা সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক শুভাশীষ চক্রবর্তী নিজে এই রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তাবিত অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের নামের প্রস্তাবকে সমর্থন জানান এবং উপস্থিত সকলের কাছেও এই প্রস্তাবকে সমর্থনের প্রত্যাশা জানান। তিনি বলেন রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার প্রশ্নে পরিবার পরিজনসহ জেলা সংগঠনের কর্মী-নেতৃত্বরা সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর। পরবর্তীতে উপস্থিত সকলে এই অভ্যর্থনা কমিটির প্রস্তাবকে সমর্থন জানান।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক বাদল দত্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি বলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মতো ঐতিহ্যশালী সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অবশ্যই সকলের সার্বিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সফল হবে।

সি আই টি ইউ নদীয়া জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস. এম সাদী বলেন এ জেলার গণতান্ত্রিক মানুষ এই রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। এক জটিল এবং কঠিন পরিস্থিতিতে আপনারা সংগঠনকে লড়াইতে রেখেছেন। ১৯৮২-তে অনুষ্ঠিত সপ্তম রাজ্য সম্মেলনে সময় শ্লোগান ছিল বামফ্রন্টকে রক্ষা করো, বামফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করো। সে সময়ে সরকারী কর্মচারীরা সে দায়িত্ব প্রতিপালন করেছেন, শ্রমিকরা করেছেন, কৃষকরা করেছেন। আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পঞ্চায়েত, পৌরসভায় কাঠামো আছে, কিন্তু গণতন্ত্র নেই। আজকের শাসকশ্রেণী যে নীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করছেন তার পিছনে রাজনীতি রয়েছে। Hire and Fire-এর নামে শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে। নতুন করে স্থায়ী লোক নিয়োগ হবে না। আমাদের এই শ্রমিক বিরোধী পলিটিক্সকে রুখে দিতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্মেলনের সফলতা নির্ভর করবে সম্মেলনের বার্তা আমরা কত বেশি মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারব, কত বেশি কর্মচারীর কাছে নিয়ে যেতে পারব।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী শুরুতেই এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাজ্য সম্মেলনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য নদীয়া জেলাকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, নিশ্চিতভাবেই তাঁরা সে দায়িত্ব সফলতার সাথেই পালন করবেন এই প্রত্যাশা তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন নদীয়া জেলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে শ্রীচৈতন্যদেবের ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ষোড়শ শতকে সকল মানুষকে এক জায়গায় সূত্রায়িত করা তা তিনি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র যাই হোন, ভিন্নধর্মী হোন, সমস্ত অংশের মানুষকে এক জায়গায় সূত্রায়িত করা, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, এর মধ্য দিয়ে একতার যে বার্তা দিয়েছিলেন, সহনশীলতা তৈরীর ক্ষেত্রে যে বার্তাটা দিয়েছিলেন আজকের দিনে তা দারুণভাবে আক্রমণের শিকার। শুধুমাত্র চৈতন্যদেবই নন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার থেকে কৃত্তিবাস ওঝা সকলেই জেলার কৃতি সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই এই জেলা এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

তিনি বলেন আজকের লড়াইটা লুটে খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের লড়াই। ১৯৮২ সালে সপ্তম রাজ্য সম্মেলন যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন লড়াইটা ছিল অধিকার অর্জনের, আর আজকে লড়াইটা অর্জিত অধিকার রক্ষার। রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে বিপুল বঞ্চনার শিকার। সরকারী দপ্তরে লক্ষ লক্ষ পদ শূন্য, অপরদিকে নামমাত্র যা নিয়োগ হচ্ছে তাও অস্থায়ী পদে, চুক্তির ভিত্তিতে। তাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বর্তমানে ধারাবাহিকভাবে দাবি জানাচ্ছে চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের, তাদের সমকাজে সমবেতনের। একই সঙ্গে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করছে সমস্ত শূন্যবদে বেকার যুবক-যুবতীদের স্থায়ী নিয়োগের। দেশের সরকার শ্রমকোডের নামে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর সর্বগ্রাসী আক্রমণ নামিয়ে আনতে চাইছে। আগামীদিনে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন করার অধিকার থাকবে কিনা, আমরা আমাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ সংগঠিত করতে পারব কি না, সেটাই বর্তমানে প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

দেশের সরকারের এই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী শ্রমকোড লাগু করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ডাকে আগামী ৯ জুলাই-র ধর্মঘটকে সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে হবে। একমাত্র সংগঠিত শক্তিই পারে দেশ ও রাজ্যের সরকারের এই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবিরোধী আক্রমণকে প্রতিহত করতে। সংগঠনের একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন নিশ্চিতভাবে পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে একই সঙ্গে আগামী দিনে নিয়োগ কর্তা পরিবর্তনের সংগ্রামে সঠিক দিশা দেখাবে।

পরবর্তীতে শুভাশীষ চক্রবর্তী এবং জেলা সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ উৎপল বিশ্বাসের নেতৃত্বে দান মেলা সংগঠিত হয়। কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে ৫,৭৯, ৬০০ (পাঁচ লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত) টাকা সংগৃহীত হয়। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের এই সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ এবং পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বহু কর্মী নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। □

দেবাশীষ রায়

আজকের পহেলগাঁও, কিছু প্রশ্ন

সুমন কান্তি নাগ

২২ এপ্রিল ২০২৫, বেলা ৩টে কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসারন ঘাটিতে তখন পর্যটকের ঢল নেমেছে, সবুজ গালিচা পাতা ঘাটিতে পড়ন্ত বিকালের অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আস্বাদন করতে করতে ভূস্বর্গে হারিয়ে গেল ২৬টি প্রাণ। শান্ত স্নিগ্ধ অনাবিল সৌন্দর্যকে খান খান করে একদল জঙ্গির আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে নির্গত গুলির আওয়াজ ত্রস্ত করে তুললো বৈসারন ঘাটিতে আসা পর্যটকদের। নিহত ২৬ জনের মধ্যে ২৫ জনই ছিলেন ভারতীয় পর্যটক, একজন ছিলেন স্থানীয় টাট্টু ঘোড়া চালক সাইদ আদিল হুসেন। জঙ্গিদের হাত থেকে নিরস্ত্র পর্যটকদের রক্ষা করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হলেন তিনিও। এই ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে কাশ্মীরে সাধারণ নাগরিকদের উপর সবচেয়ে বড় জঙ্গি হামলা। নিহত ২৬ জনের মধ্যে ১ জন মুসলমান এবং ১ জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, বাকি ২৪ জনই হিন্দু। শুধু তাই নয় এই পর্যটকেরা ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে আগত, কোনো একটি বা দুটি রাজ্যের নয়। পর্যটকদের নানা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, তবেই এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে বলে জানা গিয়েছে, এটাও দেখা গিয়েছে পুরুষদের হত্যা করে নারীদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কেন? লক্ষ্য ছিল এই জঘন্য হত্যালীলার প্রভাব যেন সমগ্র দেশজুড়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে প্রায় ৮-১০ মিনিট ধরে চলে এই তাণ্ডবলীলা।

ঘটনার পরবর্তীতে 'দ্যা রেসিস্টেন্স ফ্রন্ট' (TRF) এই ঘটনার দায় স্বীকার করে। কারা এই 'দ্যা রেসিস্টেন্স ফ্রন্ট'? জম্মু কাশ্মীরের পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী এরা হল পাকিস্থানের 'লস্কর-এ-তৈবা'-র ছায়া গোষ্ঠী। এর আগেই ডোডা ও কাঠুরিয়ায় জঙ্গি হামলায় শহীদ হয়েছেন ১০ ভারতীয় জওয়ান। আর এই জোড়া হামলার দায় স্বীকার করেছিল আরেক জঙ্গিগোষ্ঠী 'জইশ-ই-মহম্মদ'-এর ছায়াসঙ্গী 'কাশ্মীর টাইগার্স', কেবল দায় স্বীকার করেনি এরা পাশাপাশি আগামী দিনেও বড় ধরনের হামলার হুমকিও দেয়। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এই প্রথম তাদের ছায়াসঙ্গীর নাম ঘোষণা করে হামলা করলো তা নয়। আগেও এই ভাবে ছায়াসঙ্গীর মাধ্যমে সন্ত্রাসের ছক কষেছে। যেমন 'দ্যা রেসিস্টেন্স ফ্রন্ট', 'কাশ্মীর টাইগার্স', 'কাশ্মীর ফ্রন্ট ফাইটার্স' ও 'পিপলস অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট'। এই সবই ভারতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করার জন্য তৈরী করা হয়, পাশাপাশি আরেকটি উদ্দেশ্যও রয়েছে, গোষ্ঠীগুলির নামের মধ্যেই একটা ভারতীয়ত্ব ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। যেন স্থানীয় কাশ্মীরিরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই গোষ্ঠী তৈরী করেছে। আর এই ছায়া গোষ্ঠীগুলির সাম্প্রতিক সংগঠনগুলির গড়ে ওঠার সময় ছিল ২০১৯, অর্থাৎ জম্মু-কাশ্মীরের ৩৭০ ধারাকে বাতিলের পরবর্তী সময় এটা।

২৩ এপ্রিল, আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সম্পূর্ণ কাশ্মীর ঘাটি জুড়ে বনধ্। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকান-বাজার, ব্যবসা সর্বত্র প্রভাব পড়লো এই বনধ্-এর। স্লোগান গুলি ছিল, "Violence will never win", Stop innocent killings" and "Tourists Kashmir ka jaan hai"। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের হত্যার বিরুদ্ধে পথে নেমে এসেছিল। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লার বক্তব্য, "I will not use this moment to demand statehood. After Pahalgam, with what face can I ask for statehood for Jammu and Kashmir? Meri kya itni sasti siyasat hai?" ঘটনার সমস্ত দায় তিনি নিয়ে বললেন, although law and order was not under his government control, he, as Chief Minister and Minister of Jammu and Kashmir Tourism, took responsibility for having invited the tourists. "I have no words to apologise"।

পহেলগাঁও-এ ২২ এপ্রিল নৃশংস বর্বরোচিতভাবে নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করল পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা। স্বজন হারানোর চোখের জলে প্রতিশোধের আগুন জ্বলেছিল ১৪০ কোটি ভারতবাসীর। জম্মু-কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষ চেয়েছিল সন্ত্রাসবাদীদের খতম করুক সরকার। সব মানুষ দেখতে চেয়েছিল লড়াইটা হোক সন্ত্রাসবাদ আর তার মদতদাতাদের বিরুদ্ধে। উড়িয়ে দেওয়া হোক ওদের সব ঘাঁটি, তা সে সীমান্তের এপারেই হোক বা ওপারেই। ভারতবাসীর জীবনে অনেক যন্ত্রণা আছে; কাজ নেই, শিক্ষা নেই, চাষির ফসলের দাম নেই, মজুরি বাড়ে না কিন্তু জিনিসের দাম বাড়তেই থাকে। কিন্তু সব যন্ত্রণা বুকে চেপে রেখেই দেশের মানুষ পহেলগাঁও-এর নিরীহ নিরপরাধ মানুষের রক্তস্রোতের বিরুদ্ধে দেশের সেনার সাহসী ভূমিকা দেখতে চেয়েছিল। আমরা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরাও শ্রমকোড বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে আহূত ধর্মঘটকে পিছিয়ে দিয়ে রাস্তায় নেমেছিলাম সন্ত্রাসবাদ-মৌলবাদের বিরুদ্ধে। তাই দেশের সব রাজনৈতিক দল এককাট্টা হয়ে সরকারকে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দু'হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিল উদার চিত্তে।

কিন্তু দেশের তথাকথিত দেশপ্রেমিক আর এস এস ও হিন্দুত্ববাদীরা কী চেয়েছিল? এই সুযোগে দেশের মুসলিম সমাজের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা বাড়িয়ে নেওয়ার কর্মসূচী তারা গ্রহণ করে। সন্ত্রাসবাদীরা বেছে বেছে নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করে হিন্দুদের মেরেছে, লক্ষ্য কী ছিলো? লক্ষ্য ছিল দেশের অভ্যন্তরেই তৈরী হোক দাঙ্গার পরিবেশ ধর্মের হাত ধরে, দেশের মানুষই হামলা করুক দেশের আরেক মানুষকে। আর বাইরের এই শত্রুর তৈরী করা আগুনে ঘি ঢেলে আগুন বাড়াতে সাহায্য করলো 'আই টি সেল'-এর বীরপুঙ্গবরা। একদিকে মনগড়া গল্প কাহিনীর খিচুড়ি, সত্য-অর্ধসত্য-অসত্য খবরের মিশ্রণ, দেশের মানুষ যখন এককাট্টা হয়ে দেখতে চাইছে, প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করুন একাজে নিজের সরকারকে নিয়ে, সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে, দেশের সব মানুষকে নিয়ে, তখন তিনি সর্বদল বৈঠকে না এসে চলে গেলেন বিহারে দলের নির্বাচনী প্রচারে, বিদ্বেষ-বিভাজনের বিষ ঢালতে। সরকারের কাজ দেশের সংকটে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা, নাকি, দেশের অভ্যন্তরে মানুষকে বিভক্ত করে, দেশকে দুর্বল করা? সেদিনই বোঝা গিয়েছিল কী চায় আরএসএস-হিন্দুত্ববাদীরা।

ফলাফল, ২২ এপ্রিলের ঘটনার পরে উত্তরাখণ্ড, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এই চারটি রাজ্য থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতা ও হুমকির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যাচ্ছে। উত্তরাখণ্ডে সাবির আহমেদ দার সহ আরেকজন শাল বিক্রেতা মুসৌরি শহরে আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত প্রায় ১৬ জন কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা মুসৌরি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরু শহরে ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন 'পাকিস্তানের পক্ষে স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে' একজন ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এই হত্যার পরে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ কমিশনার অনুপম আগরওয়াল জানিয়েছেন। ২৮ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে এক ১৫ বছরের ছাত্র আক্রান্ত হয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে। টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে ভোপালের কংগ্রেস বিধায়ক আরিফ মাসুদকে হত্যার হুমকি দিয়েছে শচীন রঘুবংশী নামক এক ব্যক্তি।

দেশের সেনাবাহিনী এই সময়ে নীরবে দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রতিপালন করেছে যোগ্যতার সাথে, সুনিপুণভাবে। দেশের সোশ্যাল মিডিয়া ও কর্পোরেট মেনস্ট্রীম মিডিয়া যখন তাদের টি আর পি বাড়ানোর লক্ষ্যে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছিল, তখন সেনাবাহিনী অর্জুনের মাছের চোখ দেখার মতো পাক মাটিতে খুঁজেছে সন্ত্রাসীদের আঁতুড় ঘর, খুঁজেছে সীমান্তের এপারে ও ওপারে থাকা এই সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতাদের, আর যার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে ৭ মে রাতের অন্ধকারে। ৮ মে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে দাঁড়ালেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই, সাথে ভারতীয় সেনার দুই বীরকন্যা কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং। জানালেন রাত ১-০৫ থেকে ১-৩০ মিনিটের মধ্যে মাত্র ২৫ মিনিটে ভারতীয় সেনা পাকিস্থানে অবস্থিত ২৬টি সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি উড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় সেনার এই ভূমিকা যেমন মুসলিম বিদ্বেষের জিগির তোলা আই টি সেলের গোড়ায় বোমা মেরেছে, তেমনিই একই সাথে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ঘাতক আক্রমণের মাধ্যমে তাদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। পাকিস্থানে সেনার লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি, পাকিস্থানের সাধারণ মানুষ নয়। হিন্দুত্ববাদীদের এই বিপদের দিনে এগিয়ে আসে শাসকের পোষ্য সংবাদ মাধ্যম, দেশের সেনা যতই বলুক যুদ্ধ শুরু হলো মেইনস্ট্রীম মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার স্টুডিওতে আর পোষা কলমচি'র কলমে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সহ বিভিন্ন যুদ্ধের ছবি, ভিডিয়ো ও কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা নির্মিত ফুটেজ দেখিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে তৈরী করা হল দেশজুড়ে এক প্রবল যুদ্ধন্মোদনা। করাচি আক্রান্ত, লাহোর-ইসলামাবাদে ভারতীয় সেনার হানা, মুম্বাইয়ের বস্তিতে ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের ভিডিয়ো দেখিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হলো শিয়ালকোটে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র হানার ঘটনা। বাধ্য হয়ে ৯ মে প্রতিরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হল—"বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেল, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যক্তিবিশেষকে বলা হচ্ছে, যুদ্ধ পরিস্থিতি কিংবা সেনার কার্যকলাপ নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন থেকে বিরত থাকুন। এই ধরনের স্পর্শকাতর ভিডিয়ো বা তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করে দিলে আমাদের সামরিক বাহিনীর কাজে বিঘ্ন ঘটবে এবং বহু মানুষের প্রাণ বিপন্ন হবে। তার ফলাফল কী হতে পারে তা অতীতে কার্গিল যুদ্ধ, ২৬/১১'র মুম্বাই হামলা কিংবা কান্দাহার বিমান হাইজ্যাকের ঘটনায় আমরা দেখেছি। কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সংশোধনী) নিয়মবিধি অনুযায়ী, শুধুমাত্র সরকারীভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা এই ধরনের সেনা অভিযান নিয়ে বিবৃতি দিতে পারেন। সমস্ত সংবাদমাধ্যমকে যে কোনো খবরের ক্ষেত্রে সতর্ক, সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল হওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।" তবু এই লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত দেশের সেনা সিজ ফায়ার ঘোষণা করলেও, এখনো মিডিয়া সেই একই ভূমিকা প্রতিপালন করে চলেছে।

এখন প্রশ্ন তৈরী হচ্ছে বেশ কিছু, যদিও ফ্যাসীবাদী প্রবণতার এই শাসক কোনো প্রশ্ন করার স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক নন। তবু প্রশ্ন করে যেতে হবে আমাদের।

কার বা কাদের সুবিধা হলো??

প্রথমত, পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের এই স্যাডো টিম বা ছায়া গোষ্ঠী চেয়েছিলো আক্রান্তের ধর্ম জিজ্ঞাসা করে হত্যা করার মধ্য দিয়ে দেশের অভ্যন্তরেই ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন ও ঘৃণার বাতাবরণ তৈরী করতে। দেশের ঐক্য ও স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে, বাইরে থেকে জঙ্গি বা অস্ত্র না পাঠিয়েও দেশের মধ্যে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরী করতে। তাতে তারা সফল হয়েছে। একই সাথে ধীরে ধীরে পর্যটনকে ভিত্তি করে যখন স্বাভাবিক হচ্ছিল কাশ্মীর ঘাটি, যে পর্যটন পিছিয়ে থাকা মানুষের রংটি রংজির সুযোগ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিচ্ছিল বিপুলভাবে, সেই পর্যটনের উপরে আক্রমণ করে পুনরায় পেটের জ্বালায় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এই জঘন্য আক্রমণ। যা নতুন করে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করছে কাশ্মীর ঘাটিতে।

দ্বিতীয়ত, সন্ত্রাসবাদ ও তাদের মদতদাতা দেশের বিরুদ্ধে যখন দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সর্বদল বৈঠকে পাশে দাঁড়াচ্ছে দেশের সরকারের, তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী সেই বৈঠকে না থেকে বিহারের নির্বাচনের প্রচারে গুরুত্ব দিয়েছেন। দেশ না দল, এটাই এখন বড় প্রশ্ন উঠছে সবার কাছে।

তৃতীয়ত, জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তার দায়িত্ব সেখানকার রাজ্য সরকারের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই রয়েছে সেই দায়িত্ব। পুলিশ, মিলিটারি, আধাসেনা সব কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তাহলে ২৬ জন নাগরিকের মৃত্যুর দায় নেবে কে? হাত ধুয়ে ফেলে পেটোয়া সংবাদ মাধ্যমগুলোকে জড়ো করে কয়েকটা ফাঁকা বাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার ছবিতে দেশের মানুষ নিরাপদ বোধ করছেন না। বরং প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনী আগেই তো জানতো ওই বাড়িগুলো জঙ্গীদের, তাহলে এতদিন সব জেনেও চুপ করে ছিল কেন? নাকি ২৬ জনের মৃত্যুর দায় এড়িয়ে যেতেই ঘটানো হল এই ঘটনা।

চতুর্থত, ২২ এপ্রিল, ভয়াবহ ঘটনার দিন কী হলো সবাই এতদিনে জেনে গেছেন। যারাই কাশ্মীর গেছেন জানেন সেখানে কত কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা থাকে। আর এর আগেও অনন্তনাগ জেলায় অসংখ্য সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে। সেখানকারই সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটন স্থল পহেলগাঁও। সেখানে কোনো নিরাপত্তা রক্ষীর টিকিও সেদিন খুঁজে পাওয়া গেল না কেন? বলা হচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসন নাকি নিরাপত্তা বাহিনীদের জানায়নি, ফলে নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়নি। নিরাপত্তার সাথে যুক্ত গোয়েন্দা দপ্তরগুলি কি সত্যিই জীবিত রয়েছে? হাজার হাজার পর্যটক হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে পুলিশ চৌকি, আধাসেনা-সেনা বাহিনীর ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা কি দেখতে পাননি? এই প্রশ্ন ওঠা কি অস্বাভাবিক?

পঞ্চমত, একমাস অতিক্রান্ত, ঘটনার সাথে যুক্ত জঙ্গিরা এখন কোথায়? জেনেবুঝে একটা সরকার কি তার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে এত উদাসীন থাকতে পারে? ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, ৪০ জন সেনা শহীদ হয়েছিলেন পুলওয়ামাতে। সেই শহীদদের ছবি দেখিয়ে কেন্দ্রের সরকার নির্বাচনের বৈতরণী পার হলেন। অথচ, তার তদন্ত রিপোর্ট কোথায়? অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা হল ২০২০ সালে। ৫ বছরে বিচারের অগ্রগতি কী, দেশের মানুষ জানেন না। তৎকালীন সময়ের রাজ্যপাল সতপাল মালিক, যিনি নিজেও একজন শাসকদলের বড় মাপের নেতা ছিলেন, পুলওয়ামার ঘটনা নিয়ে নানান অভিযোগ তিনি তোলেন। কেন্দ্রের সরকার তাকে রাজ্যপালের পদ থেকে সরিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর তোলা মূল প্রশ্নগুলো সম্পর্কে সরকার নীরব-নিশ্চুপই রইল কেন?

প্রশ্ন অসংখ্য, প্রশ্নটা দেশের অখণ্ডতা, দেশের নিরাপত্তা, দেশের সৌভাতৃত্ববোধ, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্যের সামনে উঠে আসছে বারবার। □

আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর ন্যক্কারজনক পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

আগাপাশতলা দুর্নীতিতে মুড়ে থাকা একটি রাজনৈতিক দল ও তাদের পরিচালিত প্রশাসন নিজেদের ভুড়ি ভুড়ি অপকর্ম ঢাকতে কতটা নিচে নামতে পারে, গতকাল বিকাশভবনের সামনের ঘটনা তার আরও একটা নিদর্শন।

২০১১ সালে ক্ষমতায় বসার পর থেকেই শাসকদল পুলিশ ও গুণ্ডাদের যৌথ বাহিনীকে রাস্তায় নামিয়ে সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার কাজটা শুরু করে দিয়েছিল। একদিকে প্রশাসন পরিচালনায় সর্বস্তরে ব্যর্থতা, অন্যদিকে চুরি, জোচ্চুরি, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির একের পর এক ঘটনায় মানুষ যতই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন, ততই রাজ্য সরকার ও শাসকদলের স্বৈরাচারী আস্ফালন বাড়ছে।

আর জি কর কাণ্ড ও শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির জোড়া ধাক্কায় দিশেহারা সরকার তাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ন্যূনতম পরিসরটুকুও রাখতে চায় না। বিকাশভবনের সামনে শিক্ষকদের ওপর নামিয়ে আনা নির্মম অত্যাচার যার জ্বলন্ত উদাহরণ।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রশাসনের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকার তীব্র নিন্দা করছে এবং পিছনের দরজা দিয়ে নিযুক্ত অযোগ্য শিক্ষকদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্বহাল করার দাবি জানাচ্ছে।

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 1st Edition, May, 2025
Regd. No. : 18484/71

স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান উপলক্ষে কর্মচারী জমায়েত

শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে, বকেয়া মহার্ঘভাতা/ রিলিফ প্রদানের দাবি সহ ৯ দফা দাবিতে আগামী ২০ মে দেশব্যাপী

ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করতে চলেছে এরাজ্যের সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের যৌথমঞ্চ। গত ১৮ই মার্চ নয়াদিল্লীর প্যায়ারেলাল ভবনে দেশের দশটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের জাতীয় ফেডারেশন ও এসোসিয়েশনগুলি নয়া শ্রমকোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি সহ ১৭ দফা দাবিতে আগামী ২০ মে সারা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহবান জানিয়েছে। এরাজ্যের কর্মচারী এবং শিক্ষকসমাজও শ্রমকোড বাতিল সহ নিজস্ব ৯ দফা দাবিতে এই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হবার অঙ্গীকার করছে। ধর্মঘটের প্রাক্কালে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান উপলক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, জয়েন্ট কাউন্সিল, স্টিয়ারিং কমিটি এবং যুক্ত কমিটির আহ্বানে কলকাতার এন্টালি মার্কেটে ৫ মে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কর্মচারী জমায়েত ও সভার আয়োজন করা হয়। সভা পরিচালনা করেন মানস দাস, সুব্রত মান্না এবং বলাই মিত্রকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভার শুরুতে আসন্ন ২০ মে'র দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড দেবব্রত রায়। দেবব্রত রায় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন যে সারা দেশের সকল প্রান্তের খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, খেতমজুর, প্রান্তিক অংশের মানুষ প্রস্তুতি নিচ্ছেন কেন্দ্রের সরকারের জনবিরোধী নীতির, পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ের। আসন্ন ধর্মঘট যেমন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, একইসাথে এই ধর্মঘট দেশের অখণ্ডতা রক্ষার, সংবিধান রক্ষার লড়াই। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বকেয়া মহার্ঘভাতা/ রিলিফ প্রদানের দাবি, অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবি, রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার রক্ষার দাবি। এরাজ্যের মানুষ ধর্মঘটে শামিল হতে চলেছে শিক্ষক নিয়োগে নজিরবিহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী দুঃখপ্রকাশ করে বলেন যে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সকল অংশের কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথমঞ্চের অনেক নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত থাকলেও প্রশাসনের নির্দেশিকাজনিত সময়াভাবের কারণে সকলকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। শ্রমকোড বাতিলের দাবি সহ যে ৯ দফা দাবি নিয়ে এরাজ্যের কর্মচারী এবং শিক্ষক সমাজ ধর্মঘটে শামিল হতে যাচ্ছেন তা শুধু কর্মচারী বা শিক্ষকদের নিজস্ব দাবিদাওয়া নয়, এই ধর্মঘটের দাবিগুলি সারাদেশের আপামর শ্রমজীবী মানুষের দাবি। কেন্দ্রের সরকার উদার অর্থনৈতিক নীতির প্রসার ঘটাতে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলোকে জলের দরে কর্পোরেটের হাতে বেচে দিচ্ছে। এরাজ্যেও একইভাবে ট্রাম কম্পানির জমি, বিজি প্রেসের জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে প্রমোটারের হাতে। এর বিরুদ্ধে ওঠা কণ্ঠস্বরকে দমন পীড়নের মাধ্যমে রুখে দেওয়া হচ্ছে। আজ দেশের সংবিধানই আক্রান্ত। শ্রমকোড চালু করার মাধ্যমে সরকার শ্রমজীবী মানুষের নিজেদের অধিকারের দাবিতে, ন্যায্য মজুরির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথটাকেই বন্ধ করে দিতে চাইছে। সারা দেশজুড়ে খেটেখাওয়া মানুষ যখন ধর্মঘটের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, তখনই শাসক দেশজুড়ে বিভাজনের রাজনীতিকে উস্কে দিয়ে তা ভাঙতে চাইছে। আজ যে পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে তাতে শ্রমকোড বাতিলের জন্য সংগ্রাম এবং দেশের সংবিধান রক্ষার সংগ্রাম, দেশের মানচিত্র অখণ্ড রাখার সংগ্রাম আর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দেশের কৃষক সমাজ যেমন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের সরকারকে কৃষক বিরোধী কৃষি বিল থেকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে, একইভাবে দেশের আপামর শ্রমজীবী মানুষকেও এই সর্বনাশা শ্রমকোড বাতিলের লক্ষ্যে আগামী ২০ তারিখের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হতে হবে। এই শ্রমজীবী সমাজের অংশ হিসেবে এরাজ্যের কর্মচারী সমাজও এই দেশব্যাপী ধর্মঘটে শামিল হবে। এছাড়াও এই সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন যুক্ত কমিটির পক্ষে তাপস ত্রিপাঠি, নবপর্যায়ের পক্ষে সন্দীপ দাসগুপ্ত এবং পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষে পিনাকীব্রত সজ্জন। এদিনের সভায় কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। □

দীপঙ্কর বাগচী

৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে সমাবেশ

গত ২০ মে, ২০২৫ বিকেলে ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে শ্রমকোড বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে এবং আগামী ৯ জুলাই, ২০২৫ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলী জেলার কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশের দাবিগুলি ছিল শ্রম কোড বাতিল, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধ, এ পি এস/ ইউ পি এস বাতিল করে ও পি এস চালু, বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করার স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা। এই সমাবেশটি ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং-এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পুলিশ প্রশাসন অনুমতি না দেওয়ায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে এই সমাবেশ ওয়াই চ্যানেলে করা হয়। এদিন অর্থাৎ ২০ মে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্থানের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষের জেরে দেশের উদ্ভূত সাম্প্রতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে সেই ধর্মঘট পিছিয়ে ৯ জুলাই করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গণসংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে এদিনের সভার কাজ শুরু হয়। এরপর ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য উজ্জ্বল চক্রবর্তীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি সুভাষ মুখার্জী, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরূপ চ্যাটার্জী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, জীবন বীমা কর্মচারী আন্দোলনের নেতা অমিতাভ ঘোষ, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ, টিইউসিসি'র সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ব্যানার্জী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সভার সূচনা করতে গিয়ে সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলি শ্রম কোড বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ২০ মে যে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ডেকেছিল, সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জন্য সেই ধর্মঘটের দিন পরিবর্তন করে ৯ জুলাই করা হয়েছে। আজ ২০ মে ধর্মঘটের পরিবর্তে সারা দেশ জুড়ে ৯ জুলাইয়ের ধর্মঘটের জন্য প্রচার সভা করা হচ্ছে। শ্রম কোডের মাধ্যমে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষকে অধিকারহীন করে কর্পোরেটরা যাতে শোষণকে আরও তীব্র করতে পারে, তাদের মুনাফার পরিমাণকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে, সেই রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘট পিছিয়ে যাওয়ার ফলে শ্রমজীবী মানুষ ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য আরও অনেকটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। আগামী দু-মাস ব্যাপক প্রস্তুতি চলবে গোটা দেশ জুড়ে।

এরপর জীবন বীমা কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব অমিতাভ ঘোষকে সভায় বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি বলেন, ১৯৮৯ সালের পর থেকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। ১৯৯৪ সাল থেকে ভারতবর্ষের বীমাক্ষেত্রকে বিদেশী কর্পোরেট দুনিয়ার সামনে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বীমা কর্মচারীদের লাগাতার প্রতিরোধের ফলে আজ অবধি বীমা ক্ষেত্রে নয়া উদারবাদী আর্থিক নীতিকে প্রয়োগ

করতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার ব্যাঙ্ক ও বীমাক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ১০০ শতাংশ ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে পুরোপুরি বেসরকারিকরণ করতে চাইছে। ওদিকে শ্রম কোড চালু করার মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের ইউনিয়ন করার অধিকারকে খর্ব করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বীমা ক্ষেত্রের কর্মচারীরাও আগামী ৯ জুলাই একদিনের ধর্মঘটে শামিল হবেন।

এরপর কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী সমিতিসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অরূপ চ্যাটার্জী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ২৯টি শ্রম আইনকে বদলে শ্রমকোডে পরিণত করা হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো এবং পার্লামেন্টে বিরোধী দলগুলো বিরোধিতা করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই শ্রম কোডকে পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ যে সমস্ত অধিকার অর্জন করেছিল তার ওপর হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যেই এই শ্রম কোড চালু করতে চাইছে সরকার। আজ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, পোস্টাল সংগঠনকে স্বীকৃতিহীন করা হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে লাগাতার এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ প্রয়োজন। তার জন্যেই আগামী ৯ জুলাই গোটা দেশের শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘটে শামিল হবেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি সুভাষ মুখার্জী। কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ আগামী ৯ জুলাই ধর্মঘট করতে বাধ্য হচ্ছেন, তা তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এবং আমাদের রাজ্যের সরকার সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকারগুলি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পূর্বের ২৯টি শ্রম আইনকে স্বীকৃতি না দিয়ে শ্রম কোড চালু করা হচ্ছে। রুটি-রুজির থেকে জাত, ধর্মকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম কোড চালু করার আগেই আমাদের রাজ্যের সরকার বহু ক্ষেত্রে তা কায়েম করছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত নাগরিক পরিষেবা থেকে ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। এদিকে আমাদের রাজ্য সরকার তো লুটেরাদের সরকারে পরিণত হয়েছে! সমাজে দাসত্ব প্রথাকে যেন ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা লড়াই করলেও সেই লড়াইকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য নানা অপচেষ্টা হচ্ছে। আমাদের আরও বেশি করে রাস্তার আন্দোলনে শামিল হতে হবে এবং আওয়াজ জোরদার করতে হবে সংসদে, বিধানসভায়, আইনসভায়। জোরদার ধর্মঘট করতে হবে।

এরপর বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, মানুষের হাতে কাজ নেই; জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বাড়ছে। আর সেদিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করে নানা উন্মাদনা সৃষ্টি করা হলো কয়েকদিন আগে। ধর্মীয় বিভাজনের অপচেষ্টা হলো। সন্ত্রাসবাদকে কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে হবে এবং তার সাথে সাথে দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে হবে, যা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কেউই করছে না। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী ও কর্পোরেট তোষণকারী নীতি নিয়ে চলছে, যার ফলে দেশে বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা চরম আকার নিয়েছে। আর এরাজ্যে চলছে শুধুই লুটপাট এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আগামী ৯ জুলাই সরকারী কর্মচারী সহ সমস্ত অংশের মানুষ ধর্মঘটে শামিল হবেন।

সবশেষে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ। তিনি সমস্ত বিষয়টাই হিন্দিতে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আগামী ৯ জুলাই সর্বাত্মক ধর্মঘটের জন্য সবাইকে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সুমিত ভট্টাচার্য সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে

মে দিবসের মঞ্চ থেকে ধর্মঘট সফল করার শপথ

শহীদ মিনারে জমায়েতের একাংশ

আয়োজিত হয়েছে। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিআইটিইউ নেতৃত্ব সুভাষ মুখার্জি। সংক্ষিপ্তভাবে তিনি মে দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করেন। সমাবেশে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রমিক নেতৃত্ব অনাদী সাহু। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন টি ইউ সি সি নেতা প্রবীর ব্যানার্জী, বিইফ (BEF), পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক জয়দেব দাশগুপ্ত, বি এস এন এল ই ইউ-র সর্বভারতীয় নেতা অনিমেশ মিত্র, ইউ টি ইউ সি নেতা দীপক সাহা, এ আই টি ইউ সি নেতা বিপ্লব ভট্ট, এ আই ইউ টি ইউ সে নেতা স্বপন ঘোষ সহ শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। □

সোমনাথ পোদ্দার

সভাপতি মানস দাস সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এরপর লাল পতাকায় শোভিত সুসজ্জিত শ্লোগান মুখরিত মিছিল কর্মচারী ভবন থেকে শহীদ মিনার ময়দানের কেন্দ্রীয় সমাবেশের অভিমুখে রওনা দেয়।

শহীদ মিনার ময়দানে সি আই টি ইউ সহ বিভিন্ন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশনগুলির পক্ষ থেকে প্রতি বছরের মতো এ বছরও মে দিবস উপলক্ষে সমাবেশ

শ্রীলঙ্কার কলম্বো-তে এবারের মে দিবস

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।